ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

চিরায়ত প্রকাশন
প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

BHARATIYA PRACHIN CHITRAKALA

A Sketch on ancient Indian aesthetic art

by

Surendranath Dasgupta

প্রথম প্রকাশ : ১৯৪২

প্রথম চিরায়ত সংস্করণ

জানুয়ারি, ২০০৬ ॥ মাঘ, ১৪১২

প্রকাশক

শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অক্ষরবিন্যাস

প্রজ্ঞা প্রকাশনী

৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রাকর

এস. এস. প্রিন্ট

৮ নরসিংহ লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ISBN 81-85696-67-5

প্রচ্ছদ

সুবোধ দাশগুপ্ত

দাম : ৪০ টাকা

(Rs. 40)

সুহৃদ্বর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ
মহাশয়কে
প্রীতির নিদর্শনরূপে অর্পিত হইল

প্রাচীন মূর্তিতে শ্রদ্ধা তব অচঞ্চল
তোমাতে সৌন্দর্য তার লভুক সম্বল।
মূর্তিতে নিলীন তব চিত্তের সাধনা
নির্ভীক করেছে তব সত্যের বেদনা।

সূচিকা

সৌন্দর্যবোধের স্বরূপনির্ণয় প্রসঙ্গে একখানা বড়ো বই লেখা চলছিল। বর্তমানে এই বইখানা তারই একটি অধ্যায় মাত্র; দুই একজন বন্ধুকে অন্যান্য অধ্যায়গুলির সঙ্গে এই অধ্যায়টিও পড়ে শুনানো হচ্ছিল, তাঁরা বলেছিলেন যে এই অধ্যায়টি আলাদা করে তাড়াতাড়ি ছেপে দেওয়া উচিত। এই ঘটনার কিছু পরে প্রকাশক 'দাশগুপ্ত মহাশয়েরা' কোনও একটা ছোটো বই প্রকাশ করবার তাগিদ নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হলেন; এই সুযোগে আমি এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করবার অবসর পেয়েছি, এই জন্য প্রকাশক 'দাশগুপ্ত মহাশয়কে' আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলার নানা দিক দিয়ে ইংরেজ, ফরাসি ও জার্মান ভাষার বহু বিচক্ষণ ব্যক্তি নানা গ্রন্থ লিখেছেন, এ সমস্ত গ্রন্থকারদের মধ্যে যাঁদের নিকট আমি সাক্ষাৎভাবে ঋণী, বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁদের নাম ও মত আমি উল্লেখ করেছি, ভারতীয় চিত্রকলা ও তদন্তর্ভুক্ত সৌন্দর্যবোধের একটি বিশেষ দিক অবলম্বন করেই এই গ্রন্থখানি লেখা হয়েছে। সেই বিশেষ দিকটি গ্রন্থের শেষভাগে যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা যাঁরা গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পড়বেন তাঁদের কাছে আশা করি সহজেই ধরা পড়বে। আমার মনে হয় ভারতীয় চিত্রপদ্ধতি সম্বন্ধে গ্রন্থখানির শেষের দিকে যে সমস্ত প্রস্তাব তোলা হয়েছে সে জাতীয় প্রস্তাব অন্য কোনও গ্রন্থে তোলা হয়নি বা আলোচনাও করা হয়নি, হয়তো এই বিশেষ প্রস্তাবগুলি আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলে লোকের পক্ষে আরও সহজবোধ্য হত, কিন্তু এই গ্রন্থটির উৎপত্তির যে ইতিহাস গোড়াতেই দিয়েছি তাতেই কেন যে এই অংশ আরও বিস্তৃত করে দেওয়া হয়নি তার কৈফিয়ত দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়টি যে বইখানার অংশ সেটি ১২০০ পৃষ্ঠার অধিক, 'দাশগুপ্তেরা' চেয়েছিলেন ছোটো একখানা বই ছাপবার জন্য, তাই অধ্যায়টি যে ভাবে ছিল সেই ভাবেই তাঁদের ছাপতে দেওয়া হয়েছিল, বেশি বিস্তৃত করলে হয়তো এখন এটা ছাপাই হত না। বর্তমান সময়ে যে কুশ্রীতার ছায়া চারিদিকে সঞ্চরণ করছে তাতে এরূপ গ্রন্থ এ সময়ে প্রকাশ করবার উপযুক্ত সময় নয়; যদি ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে কোনও প্রকাশকের আগ্রহ দেখা যায় তবে অনেক কথা বিস্তৃত করেও লেখা যেতে পারে এবং ভারতীয় চিত্রকলার যে সমস্ত দিক এখানে স্পর্শ করা হয়নি সে সম্বন্ধেও ভবিষ্যতে আলোচনা করা যেতে পারে। পৃথিবীর অবস্থা আরও কিছু প্রসন্নতর হলে বড়ো বইখানাও ছাপবার উদ্যোগ করা যেতে পারে।

কোনও একটা বড়ো গ্রন্থের অধ্যায় হিসেবে লেখা বলে বইখানা একটানা রকমে লেখা

হয়েছে, বিষয় বিভাগ করবার সুযোগ ঘটেনি। তবে হয়তো এত ছোটো বইতে তার প্রয়োজনও নেই। সাধারণত এ জাতীয় বইতে সুন্দর সুন্দর ছবি থাকে। ভালো ছবি থাকলে বক্তব্য বিষয়টিও পরিষ্কার হয়, ও বইখানি হৃদ্য ও মনোজ্ঞ হয়। কিন্তু ভারতীয় চিত্রকলার অনেক ছবি অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং এই গ্রন্থের অনেক পাঠকই সেই সমস্ত ছবির নমুনার সহিত পরিচিত। এই গ্রন্থে ছবির চেয়ে ছবির তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রধানভাবে আলোচনা করা হয়েছে, কাজেই ছবির অভাব হয়তো অনেকে ক্ষমা করবেন। আমার যতদূর জানা আছে তাতে বাংলা ভাষায় এই জাতীয় আলোচনা বেশি হয়নি এবং এইজন্য এই রকম একখানা ছোটো গ্রন্থ প্রকাশ করবার ধৃষ্টতা পাঠকেরা অনায়াসে মার্জনা করতে পারবেন; অল্প পরিসরের মধ্যে লেখা হয়েছে বলে ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি সম্বন্ধে নানা মতের আলোচনা বা নানা মতের সহিত দ্বন্দ্ব করবার সুযোগ ঘটেনি; ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধেও কিছু বলতে পারিনি।

আমার নিজের চক্ষুর শক্তি ক্ষীণ, এবং আমাকে বহু কর্মেও নিরন্তর ব্যাপৃত থাকতে হয়, এইজন্য নিজে ভালো করে প্রুফ দেখতে পারিনি, সেজন্য হয়তো স্থানে স্থানে ছাপার ভুল হয়ে থাকবে। এসম্বন্ধে আমি একরূপ নিরুপায়। আমার ছাত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী সুরমা শাস্ত্রী এম. এ., পি. এইচ. ডি., যদি স্বতঃপ্রবৃত্তা হইয়া প্রুফগুলি দেখিয়া না দিতেন তবে ইহার ভ্রমত্রুটি আরও অনেক বেশি হইত, তাঁহার এই সাহায্যের জন্য তাঁহাকে সর্বান্তকরণে ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ জানাইতেছি।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা

আমাদের দেশে দেবদেবীর যে সমস্ত মূর্তি পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাতে দেবদেবীর সহিত মনুষ্যরূপের সাদৃশ্য থাকিলেও সর্বতোভাবে একরূপতা নাই। দুর্গা দশভুজা, ব্রহ্মা চতুর্মুখ, শিব পঞ্চমুখ ইত্যাদি প্রকারে মুখ ও হাতের সংখ্যার নানাবিধ বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। তাহা ছাড়া অনেক স্থলেই কোনও দেব বা দেবীর যে মূর্তি গড়িবার পদ্ধতি আছে তাহাতে কোনও বিশিষ্ট পর্যায়ের মনোভাবকে রূপের দ্বারা পরিকল্পিত করিবার চেষ্টাই প্রধানভাবে পরিলক্ষিত হয়। সর্বজনবিদিত শিবের ধ্যানটি নিলেই দেখা যায় :

'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্' এই ধ্যানের মধ্যে দেখা যায় যে শিব কেবল যে রজতগিরিনিভ চারুচন্দ্রাবতংস তাহা নহে তিনি বিশ্বাদ্য বিশ্ববীজ ও নিখিলভয়হর। তাঁহার মূর্তি গড়িতে গেলে পাঁচটি মুখ এবং তিনটি চক্ষু দিলেই হইবে না, সেই মূর্তির মধ্যে এমন ভাবব্যঞ্জনা থাকা চাই যাহাতে মূর্তি দেখিলেই মনে হয় যে ইনি সকলের সকলপ্রকার ভয় হরণ করিতে সর্বদা প্রস্তুত। ইনি সর্বদা প্রসন্ন। কাজেই এইখানে দেখা যাইতেছে যে কেবল একটি মানুষের মূর্তি গড়িয়া তাহাতে ৫টি মুখ ৩টি চক্ষু জুড়িয়া দিলেই মহেশ্বরের মূর্তি হয় না। তাঁহাকে গড়িতে হইলে তাঁহার স্বাভাবিক ভয়হারিত্ব সেই মূর্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাওয়া চাই। এই ভাবপরিস্ফূর্তি বা Expression হিন্দু, বৌদ্ধ বা জৈন মূর্তি গড়িবার একটি অত্যাবশ্যক মূল কথা। কিন্তু প্রাচীন গ্রিকদের মূর্তি গড়ার মধ্যে এই Expression জিনিসটির সমাদর ছিল না। প্রাচীন গ্রিকদের দেবদেবীরা সম্পূর্ণভাবে মানুষের মতোনই ছিলেন সেইজন্য তাঁহাদের মূর্তি পরিকল্পনায় মানুষের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য অনুকরণের বিধি ছিল। কালিদাস 'কুমারসম্ভব'-এ পার্বতীর রূপবর্ণনাব্যপদেশে বলিয়াছেন :

'সর্বোপমাদ্রব্যসমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশংবিনিবেশিতেন।
সা নির্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থসৌন্দর্যদিদৃক্ষয়ের॥

অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু যে বিষয়ে সুন্দর তাহা সমস্ত একত্র আহৃত করিয়া বিধাতা পার্বতীকে গড়িয়াছিলেন। তিলোত্তমাকেও ব্রহ্মা এই প্রণালীতেই গড়িয়াছিলেন কিন্তু

গ্রিকদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি ছিল না। সেইজন্য তাঁহারা যে সমস্ত মনুষ্যমূর্তির পরিকল্পনা করিতেন তাহাতে মানুষের মধ্যে যেখানে যাহার শ্রেষ্ঠরূপ তাহাই আহরণ করিয়া একত্র বিন্যাস করিয়া দেবমূর্তির পরিকল্পনা করিতেন। আমাদের সাহিত্যে একদিকে যেমন প্রকৃতি হইতে সৌন্দর্য আহরণ করিতে একত্র সন্নিবেশের দ্বারা সুন্দরমূর্তি পরিকল্পনার কথা আছে, অপরদিকে তেমনি অন্তরের ধ্যানপরিকল্পিত রূপকে বাহিরের মূর্তি প্রদান করিলে যে শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য উৎপন্ন করা যায় তাহার কথাও উল্লিখিত আছে। শকুন্তলার রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস বলিতেছেন :

'চিত্তে নিবেশ্য পরিকল্পিতসত্ত্বযোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতানু।'

অর্থাৎ বিধাতা তাঁহার চিত্তের মধ্যে যে মূর্তিটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সমগ্র রূপসম্ভার দিয়া এবং তাহাতে প্রাণসংযোগ করিয়া শকুন্তলাকে গড়িয়াছিলেন। ভাবসন্নিবেশ না থাকিলে যে চিত্রের সাফল্য হয় না তাহা বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস বিদূষকের মুখে দুষ্যন্তের চিত্রের প্রশংসাস্থলে বলিতেছেন— 'সাহু বঅস্স মহুরাবত্থাণদংসনিজ্জো ভাবাণুপ্পবেসো।' যদিও ভাব বা personality এবং emotion-এর প্রকাশ (expression) চিত্রের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত তথাপি প্রকৃতের যথানুবর্তিতার দিকেও চিত্রীর দৃষ্টি রাখিতে হইত। সানুমতি দুষ্যন্তের চিত্র দেখিয়া বলিতেছেন যে মনে হইতেছে যেন সখী শকুন্তলা সম্মুখেই রহিয়াছে। ভ্রমর দেখিয়া বিদূষকের এমন ভ্রম হইয়াছিল যে সে দণ্ডকাষ্ঠের দ্বারা তাহাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া perspective বা দেশবিনিবেশ ব্যবস্থাও লঙ্ঘিত হইত না। দুষ্যন্তের চিত্রে পার্বত্য দেশটি নতোন্নত হইয়াই দেখা দিয়াছে। বিদূষক বলিতেছে— 'খলতি বিয় মে দিট্ঠিনিন্নোন্নতপদেসেসু।' তাহা ছাড়া একটি চিত্র একক না হইয়া অন্যের সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ পাইলে তাহার যথার্থ বৈশদ্য প্রকাশিত হয়। এইদিক দিয়া composition বা বহু ব্যক্তির অবস্থান ব্যবস্থার দিকেও দৃষ্টি ছিল। তাহা ছাড়া আর একটি বড়ো জিনিসের দিকে দৃষ্টি ছিল, তাহা এই যে, মানুষকে আঁকিতে গেলে প্রকৃতির আবহাওয়ার মধ্যে ছাড়া তাহাকে ফুটাইয়া তোলা যায় না। এই অনুসারেই দেখা যায় যে শকুন্তলাকে আঁকিবার সময় কেবলমাত্র যে সখীদের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা নয়, প্রয়োজন হইয়াছিল মালিনী নদীর, তাহার শুভ্র বালুতটে ঈষদৃশ্যমান হংসমিথুন, অপরদিকে হিমালয়ের শিখর ও তাহার প্রান্তদেশে নানাস্থানে উপবিষ্ট হরিণ, শাখা-লম্বিত-বল্কল আশ্রমতরু ও তাহার নীচে আশ্রমমৃগীর কৃষ্ণমৃগের শৃঙ্গে বামনয়নের কণ্ডূয়ন। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে গ্রিকদের মধ্যে মনুষ্যমূর্তি নির্মাণের যেরূপ যথাযথ অনুকরণের দিকেই প্রধান দৃষ্টি ছিল, ভারতবর্ষের চিত্রনির্মাণ পদ্ধতিতে তাহা ছিল না। একদিকে যেমন ছিল যথাযথের দিকে দৃষ্টি, অপরদিকে তেমনি ছিল জীবনের ও ভাবের অভিব্যক্তি, আর এই দুইটিকে প্রকাশ করা হইত রচনাসন্নিবেশে, দেশবিনিবেশব্যবস্থায় ও অন্তরঙ্গ প্রকৃতির আনুষঙ্গিক অভিব্যক্তিরূপে। ভারতবর্ষীয় চিত্রশিল্পে ও ভাস্কর্যে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটি বিশেষ নির্দিষ্ট মান রক্ষিত হইত। এই

মানকে বলা হইত 'তাল'। আশ্চর্যের বিষয় এই যে মস্তিষ্কের দৈর্ঘ্যকেই তালের প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা হইত এবং উত্তরকালে Leonardo da Vinci-র গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনিও মস্তিষ্কের প্রমাণকেই আদিমানরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারই তুলনায় অবয়ববিশেষের মান গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণকেই 'তাল' বলা হইত। মূর্তি বড়ো হউক বা ছোটো হউক অবয়ব-সন্নিবেশে আপেক্ষিক তালের প্রমাণ যথানির্দিষ্টভাবে থাকিলেই তাহা সুসঙ্গত বলিয়া গণ্য হইত। শরীরের ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে এই তালের যে পরিবর্তন হয় চিত্রসূত্রে তাহাও নির্দিষ্ট আছে। চিত্রের মধ্যে রেখাসন্নিবেশের দক্ষতাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

'রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্যা
বর্তনাং চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি
বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ।'

(চিত্রসূত্র, বর্তনাধ্যায় — 'বিষ্ণুধর্মোত্তর', তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৩৫)

কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষীয় চিত্র বা ভাস্কর্যপদ্ধতিতে আর একটি বিশেষ কথা উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় চতুর্থ শতক হইতেই ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি প্রধানত দ্যোতনামূলক করিবার চেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল। দ্যোতনা বলিতে ইংরাজিতে যাহাকে significance বা suggestion বলে তাহাই বুঝি। অর্থাৎ চিত্রের মধ্যে এমন কিছু ভাষা রাখিতে হইবে এমন কিছু ইঙ্গিত রাখিতে হইবে যাহাদ্বারা বিশিষ্ট মনোভাবকে নির্দিষ্টরূপে বুঝানো যায়। বুদ্ধের নানামূর্তির মধ্যে নানাপ্রকার মুদ্রার পদ্ধতি দেখা যায়। মুদ্রা বলিতে হাত রাখিবার বিশেষ অবস্থান বুঝা যায়। যথা—অভয়মুদ্রা, ভূমিস্পর্শমুদ্রা ইত্যাদি। Dr. Kramrisch এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন : 'From its intransitive experience it is turned, with open palm in the transitive re-assurance which the presence of the divinity gives to the devotee. The gesture in its origin and act exists now in the timeless state which it establishes itself. It is unchangeable in the duration of its being. In this fixed position it is vibrant with life, artistically potent and not a dead symbol. The rhythmical life movement passes through its palm and fingers in telling curves and full modellings.' (*Indian Sculpture*, P. 57). চিত্রী বা শিল্পীর মনের মধ্যে যে বিশেষ অর্থ বা তাৎপর্য বা উদ্দেশ্য আছে তাহা প্রকাশ করিবার জন্যই তিনি চিত্র আঁকিতেন কোনও বহিরঙ্গ বস্তুর অনুকরণের জন্য নহে বা কেবল সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যও নহে। এই প্রসঙ্গে Dr. Kramrisch বলিতেছেন : 'Every scene or image becomes a vāhana and every part of it subordinate to that aspect, is transformed according to its meaning within, and in relation to the whole ......where everything has its bearing in a context that results from artistic creations, and is yet meant to indicate an existence

unchangeable in the duration of its action, every part of the compositional unity must be unmistakable with regard to its suggested purport and has to be rationalised.' (Ibid, P. 57). কোনও অতিপ্রাকৃত মানুষ আঁকিতে গেলে তাহাকে এমন করিয়া আঁকা হইত—যাহাতে তাহা দেখিলেই তাহার মধ্যে অতিপ্রাকৃত শক্তির সম্ভাবনা বুঝা যাইত। মাতৃত্বকে বুঝাইবার জন্যই গাঢ়নিতম্বা উন্নতপয়োধরা রমণী আঁকা হইত, ভোগের দৃষ্টিকে বাড়াইবার জন্য নহে। সেইজন্যই সরস্বতীর ধ্যানে তাঁহার মূর্তির বর্ণনায় তাঁহাকে 'কুচভরনমিতাঙ্গীং' বলা হইয়াছে। অনেকগুলি বাহু, মস্তক বা নেত্র আঁকিয়া শিল্পী বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন কোন্ দেবের বা দেবীর অদ্ভুত বা অসম্ভাব্য শক্তিসামগ্রী। বাহিরে মনুষ্যের আকৃতি দিয়াও অনেকসময় সেই মানুষকে স্বাভাবিক মানুষের মতো করিয়া আঁকা হইত না, অথচ মূর্তিটি দেখিলেই তাহার মধ্যে জীবনশক্তির অমৃতময় তরল বিদ্রুতি স্ফুট হইয়া উঠিত। Dr. Kramrisch এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন : 'It is not scientific in the sense of observation and description of its structure but it is suggestive of the vital current that percolate the entire living frame, which in relation to them is secondary and conditioned. Innervation, the nervous tension of the body, expressive of animal vitality and of emotion is relaxed. In the soothed condition it lies dormant, its capacity of being highly strung is kept in ever present readiness to envelope the continual circulation of the life sap. i.e. of the vegetative principle of the vital currents of the inner life movement. The mascular substance seems to melt away when it is being sustained and transmuted. It is wrapped all round the bones that are not visible so that all joints appear as passages of ceaseless and cosistent movement. The transubtiation of the body is made visible by the transformation of the plastic means.' (Ibid, P. 59)

দেহের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত অজস্র গতির সমাবেশ করিবার জন্য বাস্তব মানুষের যথানিবিষ্ট অস্থিনিচয়ের ব্যবস্থা ও পদ্ধতি ক্রমশ শিথিল হইয়া আসিল এবং সমগ্র দেহে একটি লতায়িত ভাব আনিবার চেষ্টায় মূর্তিগুলি তাহাদের স্বাভাবিকতা হারাইয়া চিত্রজগতের বিশেষ স্বরূপ লইয়া ও ভাবব্যঞ্জনার বিশেষ বিশেষ প্রতীক হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। শিল্পজগতের নূতন ভাষার সহিত আপনাকে খাপ খাওয়াইবার চেষ্টায় মূর্তিগুলির মধ্যে শৈল্পিক ভাবের সামঞ্জস্য প্রাকৃতিক বাস্তব সামঞ্জস্যের স্থান অধিকার করিতে লাগিল। কিন্তু গুপ্তদের সময় হইতেই এই অভিব্যঞ্জনাপ্রধান মূর্তিসৃষ্টি ক্রমশ আবার একটু একটু করিয়া বাস্তবের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল। আমাদের দেশের নানাবিধ দেবদেবীর মূর্তি সৃষ্টির মধ্যে কি পরিকল্পনা ও কি ভাব অভিব্যঞ্জিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহা এখন বিশেষভাবে বুঝিবার উপায় নাই। যে আদিকালে ওই সমস্ত মূর্তি সৃষ্ট হইয়াছিল, সে সময়ে সাধকের চিত্তের সহিত শিল্পীচিত্তের যোগ ছিল এবং সাধকের চিত্তের কল্পনা শিল্পী তাহার মূর্তি নির্মাণের ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিত। ওই ইঙ্গিত সেকালে বিদগ্ধ সমাজে সুখ্যাত ও সুপরিচিত ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে যখন লোকে ওই সমস্ত ইঙ্গিত

বিস্মৃত হইল তখন শিল্পশাস্ত্র বা আগম শাস্ত্রের বাঁধাধরা নিয়মপদ্ধতির মধ্য দিয়া প্রাচীন পদ্ধতিগুলি রক্ষিত হইল বটে কিন্তু কি কারণে কোন্ মূর্তিকে কি প্রকার গঠন দেওয়া হইল সে সম্বন্ধে লোকে আর কোনও লক্ষ রাখিত না। ওইসব সময়ের গ্রন্থ পড়িলে দেখা যায় যে অমুক অমুক দেবদেবীমূর্তি অমুক অমুক প্রণালীতে বা পদ্ধতিতে গঠন করিতে হইবে এবং তাহা না করিলে সেই সেই পূজার ফল হইবে না, — এইটুকু মাত্র বলিয়াই বিধিদাতারা ক্ষান্ত হইয়াছেন। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর'-এ লিখিত আছে। (পৃষ্ঠা ৩৩৩)

'প্রমাণহীনাং প্রতিমাং তথা লক্ষণবর্জিতাম্।
আবহিতাঞ্চ বিপ্রেন্দ্রৈর্নাবিশন্তি দিবৌকসঃ।। ২৩
আবিশন্তি তু তাং নিত্যং পিশাচা দৈত্যদানবাঃ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন মানহীনাং বিবর্জয়েৎ।।' ২৪

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রপাঠে দেখা যায় যে যদিও নানাশাখার নানা দর্শনমতে মানবজীবনের নানা সমস্যার ও তাহা পরিপূরণের চেষ্টা করা হইয়াছে তথাপি আধুনিক জগতে যেমন ব্যক্তিগত জীবনের নানা সমস্যা ব্যক্তিগত উপলব্ধির দিক দিয়া আলোচনা করা হয় সে কালে সেরূপ চলিত না। যাহা কিছু প্রশ্ন উঠিত তাহা সর্বসাধারণ মানবের জন্য। যে কোনও আদর্শ ধরা হইত তাহাও সকলের জন্য। সাধারণ জীবন হইতে ব্যক্তিজীবনের বিশিষ্টতা লক্ষ করিয়া সেই বিশিষ্টতার যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ দাবি, যে সমস্ত বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা ও জটিল সমস্যা তাহার স্বতন্ত্র পর্যালোচনা হয় নাই। ভারতীয় শিল্পকলার মধ্যেও সেই রকম, শিল্পী তাঁহার মনের বিশেষ বিশেষ ভাবকে রূপ দিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি যে সমাজে বাস করিতেন সেই সমাজে যে সমস্ত ভাবপ্রবাহ সুপ্রচলিত ছিল তাহাকেই শিল্পের মধ্যে প্রচলিত ইঙ্গিতের ভাষায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কাহারও ব্যবহারিক দক্ষতা বেশি ছিল কাহারও ব্যবহারিক দক্ষতা কম ছিল, কিন্তু পরিকল্পনা হিসাবে ব্যক্তিগত নূতন কল্পনা অতি কমই ছিল। প্রায় কোনও শিল্পীই তাঁহার নাম লিখিয়া রাখিয়া যান নাই। গ্রন্থাদিতেও তাঁহাদের নাম বড়ো একটা পাওয়া যায় না। যে ভাব তাৎকালিক সমাজে লোকের চিত্তের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইত ও সাধকের কল্পনার মধ্যে স্থান পাইত পাথরের মধ্য দিয়া বা রঙের মধ্য দিয়া তাহাকে রূপ দেওয়াই ছিল শিল্পীর কাজ। তথাপি ব্যক্তিগত শিল্পীর হাতে পড়িয়া প্রত্যেক মূর্তির মধ্যেই নানাবিধ অবান্তর বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠিয়া শিল্পীর বিশিষ্টতা অনেক স্থলেই রক্ষিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ অতি বিরাট দেশ ও ইহার বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্নজাতীয় লোকেরা অতি প্রাচীন কাল হইতে শিল্পসেবা করিয়া আসিতেছে এবং যুগে যুগে মনুষ্যের চিত্তবৃত্তির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পপদ্ধতিরও নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিভাগেই সেই সেই দেশের নানাবিধ শিল্পসংস্কার চলিয়া আসিয়াছে। সেই সমস্ত সংস্কারের সহিত ভাবসন্নিবেশ ও ইঙ্গিত সন্নিবেশের প্রক্রিয়া যুক্ত হইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিভাগের বিভিন্ন যুগের শিল্পগুলির নানা বিশিষ্টতা সম্পাদন করিয়াছে।

গ্রিক শিল্পে ভাস্করের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এই যে তিনি কেমন করিয়া কঠিন পাথরকে

কাটিয়া কাটিয়া একটি মানুষের হুবহু সাদৃশ্য তাহার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবেন। কিন্তু ভারতীয় ভাস্করের প্রধান দৃষ্টি ছিল এইখানে যে তিনি কেমন করিয়া একটি ধ্যানগৃহীত জীবন্তভাবকে রূপ দিবেন — জীবনের পরিস্পন্দে জড় প্রস্তরকে স্পন্দময় করিবেন, ভাবের বিদ্রুতিতে মূর্তিটিকে প্রাণময় করিবেন। শিল্পীর সমস্ত চেষ্টাই যেন এই দিকে প্রসারিত হইয়াছে যে তিনি কেমন করিয়া তাঁহার সাধনাদ্বারা প্রস্তরের জীবনকে প্রাণকে আত্মাকে তাঁহার ধ্যানবৃত আত্মা বা জীবনের সহিত অখণ্ড ঐক্যে পরিণত করিতে পারেন। তাঁহারা রেখাসন্নিবেশের দ্বারা মূর্তির বাহ্য পরিচয় দিতেন, কিন্তু তাহার পর তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই ছিল তাঁহাদের মূর্তিকে প্রাণময় করিবার জন্য। 'বিষ্ণুধর্মোত্তর'-এ যে লিখিত আছে :

'রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্যাঃ বর্তনাঞ্চবিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়ো ভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ॥'

—ইহার তাৎপর্য এই যে প্রাচীন আচার্যেরা রেখাসন্নিবেশদ্বারা বস্তুর স্বাভাবিক আকারকে ফুটাইয়া তোলা প্রশংসার চক্ষে দেখিতেন। কিন্তু পণ্ডিতেরা চাহিতেন তাহার প্রাণপ্রদ রূপ। কালিদাসের মতো পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে উভয়ের যেখানে সুসঙ্গত এবং সম্যক মিলন ঘটিত সেই চিত্রকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। কিন্তু বাস্তুবিক ভারতীয় শিল্পকলা দেখিলে দেখা যায় যে কতকগুলি শিল্পের মধ্যে বাস্তবের দিকে অর্থাৎ রেখাসন্নিবেশের দ্বারা যথাযথ মনুষ্যমূর্তিকে গঠন করিয়া তোলার দিকে শিল্পীর প্রধান দৃষ্টি ছিল। গান্ধার শিল্পে এবং অতি প্রাচীন মহেঞ্জোদারো শিল্পে ইহার দৃষ্টান্ত দেখানো যায়। অজন্তার শিল্পের মধ্যে কতকগুলিতে যেমন দেখা যায় যে বর্তনা এবং রেখার যথার্থ সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে, তেমনি অপর অনেক চিত্রের মধ্যে দেখা যায় যে বর্তনার অংশ এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা রেখাকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছে, শুধু মনুষ্যমূর্তি অঙ্কনের মধ্যে নহে কিন্তু প্রাকৃতিক পদার্থ অঙ্কনের মধ্যেও লাবণ্য ও জীবন অনেক সময়ে কী বিস্ময়করভাবে প্রস্ফুট হইয়াছে। আবু পর্বতের দিলোয়ারা মন্দিরে ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যদিও ভাস্কর্যের মধ্যে কোনও মানুষের যথাযথ প্রতিকৃতি বড়ো একটা পাওয়া যায় না কিন্তু তথাপি সংস্কৃত সাহিত্য পড়িলে দেখা যায় যে ধনীদের মধ্যে বিশেষত রাজাদিগের মধ্যে ছবিতে এইরূপ প্রতিকৃতি অঙ্কনের ব্যবস্থা প্রচুরভাবে বিদ্যমান ছিল। সাধারণ লোকের গৃহভিত্তিতেও চিত্র অঙ্কনের বিধি ছিল। চিত্রসূত্রে এইরূপ মনুষ্যের প্রতিকৃতি এবং তাহাছাড়া নানাবিধ প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকিবার নানা ভঙ্গি ইঙ্গিত বা পদ্ধতির ফল উল্লিখিত আছে।

ভাবাভিব্যক্তিই ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতির প্রাণপ্রদ ধর্ম। সেইজন্যই ভাবটিকে ফুটাইবার জন্য দেশকালের বুদ্ধি ব্যাহত করিতে ভারতীয় চিত্রী কখনও দ্বিধা করিতেন না। একটি চিত্রের মধ্যে জীবনের নানাস্তরের নানাঘটনা চিত্রী একত্র করিয়া প্রকাশ করিতে অনেক সময়ই প্রয়াস করিয়া থাকেন। সম্ভবত তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে একটি দৃষ্টির ক্ষণের মধ্যে সমগ্র জীবনটিকে যুগপৎ উপনীত করা। কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা ঘটিল সময়ের এই পারম্পর্য তাঁহারা চিত্রে অনেক সময়ই ফোটানো আবশ্যক মনে করিতেন না।

একবিন্দু শিশিরের মধ্যে যেমন সমস্ত বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হইতে পারে তেমনি চিত্রীর ধ্যানলোকের মধ্যে বর্ণনীয় জীবনটি একমুহূর্তে আবিষ্কৃত হইত। সেই আবিষ্কারটিকে তিনি দর্শকের নিকট উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিতেন। এই চিত্রীদের চক্ষুতে বস্তুর আকারও তেমনি নিয়ত ও অবিচ্ছিন্ন নহে। যৌগিক বিভূতির বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাই যে যোগী অণুর ন্যায় হ্রস্ব হইতে পারিতেন এবং অতি দীর্ঘকায় হইতে পারিতেন। কি কাব্যে কি চিত্রে কোনও জীবের আকার পরিবর্তনে কোনও অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় নাই। হনুমানের বর্ণনায় আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যে হয়তো তিনি মক্ষিকাকারে কোথাও প্রবেশ করিলেন, কোথাও বা ক্ষুদ্র বানরের আকারে দেখা দিলেন, কোথাও বা বিশাল গন্ধমাদনকে স্কন্ধে লইয়া লম্ফ দিয়া সাগর উত্তীর্ণ হইলেন। এই কল্পনার নিয়ন্ত্রণহীনতায় যেমন ভারতীয় কবিরা ভীত হইতেন না, ভারতীয় চিত্রীও তেমনি এই জাতীয় অঙ্কনে শঙ্কিত হইতেন না। চিরস্থায়ী যে আত্মা সমস্ত জগতের প্রাণপতি হইয়া রহিয়াছেন, অব্যক্ত প্রকৃতি তাঁহারই লীলাশক্তি। অব্যক্ত অবস্থায় তাহা প্রত্যক্ষ করা যায় না, বিকৃত অবস্থায় কিন্তু তাহাই ইন্দ্রিয়গোচর হয়। কাজেই কোনও অলৌকিক বিষয় বর্ণনা করার সময় বস্তুর স্বাভাবিক আয়তন, আকৃতি বা প্রকৃতির পরিবর্তন করিতে তাঁহারা দ্বিধাবোধ করিতেন না। বুদ্ধের মাতা মায়াদেবী যখন স্বপ্ন দেখিলেন যে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন সেই স্বপ্নে তিনি দেখিলেন যে শ্বেতহস্তীরূপে বুদ্ধ তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিতেছেন। ভার্হুটের স্তূপে ইহার যে চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহাতে এই হস্তীটি মায়াদেবী অপেক্ষা দীর্ঘায়তন নহে। শুধু ইহাই নহে একটি চিত্রের রচনাপ্রসঙ্গে তরু গুল্মাদির ও অন্যান্য সহচর মূর্তি যখন অঙ্কিত হইত, তখন যদিও প্রত্যেক মূর্তিরই একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা দেওয়ার চেষ্টা করা হইত, তথাপি কোনও মূর্তিরই এমন বিশিষ্টতা থাকিত না যাহাতে তাহারা স্বতন্ত্র হইয়া পৃথক ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। সকলগুলি চিত্র লইয়া এবং তাহাদের বিশিষ্ট অবস্থান-সঙ্কেত লইয়া একটি অখণ্ড চিত্রের অখণ্ডভাব যাহাতে দ্যোতিত হইতে পারে, এই ছিল চিত্রীর লক্ষ্য। এই দৃষ্টিতে না দেখিয়া ইয়োরোপীয় রীতিতে ভারতীয় চিত্র বুঝিতে গেলে ভারতীয় চিত্র বোঝা সহজ হয় না। বুদ্ধ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইতেছেন ইহা দেখাইবার জন্য চিত্রী হয়তো একটি সোপানাবলি দেখাইয়া তাহার উপর দুই একটি পদচিহ্ন বা পদ্মফুল আঁকিয়া তাঁহার কার্য শেষ হইল বলিয়া মনে করিতেন। বুদ্ধের আবির্ভাব বুঝাইবার জন্য তাঁহার শরীর দেখাইবার কোনও প্রয়োজন নাই। বুদ্ধ নামিলেন, সংঘ নামিলেন, ধর্ম নামিলেন ইহা দেখাইতে তিনটি ধাপ অঙ্কিত করা হইল। উপরের ধাপে একটি পদচিহ্ন এবং নিম্নতম ধাপে একটি পদচিহ্ন দেওয়া হইল, চারিদিকে ভক্তেরা করজোড়ে রহিয়াছেন, দেবযোনিরা উপরে উড়িয়া চলিয়াছেন, অপরদিকে বুদ্ধের আসন ও বোধিদ্রুম অঙ্কিত হইয়াছে, এইরূপে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব বর্ণিত হইল।

একটি বিরাট পুরুষ প্রকৃতির সহযোগে যে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন এবং তিনিই যে ওষধি, বনস্পতি ও বিশ্বভুবনকে আবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন, হিন্দু দর্শনের ইহা একটি সুগৃহীত মর্ম। সেইজন্য দেখিতে পাই যে ভারতীয় চিত্রে একদিকে যেমন বৃক্ষলতা, পুষ্প,

গিরিনদী, বিহঙ্গ ও চতুষ্পদ জন্তুর সহিত ভারতীয় দেবদেবীদের একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে, অপরদিকে তেমনি দেখি যে এই সমস্ত প্রাকৃতিক উদ্ভিদ ও জন্তু চিত্রীরা যখনই আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই সেগুলির সহিত মূল চিত্রের একটি সপ্রাণ যোগ রহিয়াছে। একদিকে আমরা দেখি বিষ্ণু শেষ শয্যায় শায়িত, তাঁহার নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, অনন্ত সাগরের মধ্যে অনন্ত নাগ, তাঁহার সহস্রশীর্ষ, তিনিই হইলেন শেষ। শেষ বলিতে বুঝা যায় যে আর কাহারও অঙ্গ নহে, যে আর কাহারও ক্রিয়ার্থ নহে, যে সকলের চরম উদ্দেশ্য। একপক্ষে দেখিতে গেলে এই শেষ নাগই ভগবানের দ্যোতক; তাঁহার সহস্রশীর্ষের দ্বারা বহুধা বিচিত্র জগৎকে তিনি দর্শন করিতেছেন। কিন্তু এই মূর্তিতেই শেষ পরিকল্পনা নহে, শেষ যে আপনার মধ্যে শেষীকে বিধারণ করিয়া রাখিয়াছে তাহা না দেখাইতে পারিলে শুধু শেষের পরিকল্পনা নিরর্থক হয়। এইজন্য জগতের আদি মানব, আদি মানবীরূপে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী তাহার উপর বিরাজ করিতেছেন। শেষিত্ব হইতে গেলেই মানুষের সম্বন্ধ ছাড়া তাহার পরিকল্পনা করা যায় না। মানব মানবীর সঙ্গেই সৃষ্টির ধারণা, সেইজন্য বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার উৎপত্তি। সাধারণত মনে করা যাইতে পারে যে নারীর নাভিকমল হইতে সর্জনক্রিয়ার আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নির্বিকার পুরুষের প্রতি শেষিত্বরূপেই নারীরূপিণী প্রকৃতির অবস্থান। সমস্ত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া পুরুষের প্রতি শেষিত্বরূপে রহিয়াছে, সেই জন্যই বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে সৃষ্ট্যভিমানী ব্রহ্মার উৎপত্তি। শতদল পদ্ম যেমন মুকুলিত অবস্থা হইতে ক্রমশ বিকাশপ্রাপ্ত হয়, সমস্ত সর্জনক্রিয়া তেমনি যে একটি বিকাশের মধ্যে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, এবং সেই সমস্ত বিকাশ যেন একটি মৃণালসূত্রে অনন্তশায়ী পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতেই বিধৃত হইয়াছে ও তাহাতেই তাহার পারিণামিক লয়, ইহাই বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে সূচিত হইতেছে। এই যে কমলের কল্পনা, সর্পের কল্পনা, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মার চিরন্তন আসনরূপে পদ্মের কল্পনা, ইহা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে কবি বা চিত্রীর চিত্রে প্রাণিজগৎ ও উদ্ভিদ্‌জগৎ মনুষ্যজগতের সহিত এবং দেবজগতের সহিত একান্বয়ে ও একস্পন্দনে গৃহীত হইয়াছিল।

এই জন্যই এই পদ্ম আঁকিবার সময় শিল্পী তাহাকে সাধারণ হ্রদের পদ্মের ন্যায় আঁকেন না, অনন্তনাগকে আঁকিবার সময়ও তাহাকে একটি দীর্ঘ বোড়া-সাপের ন্যায় আঁকেন না। এগুলি আঁকিবার সময় তিনি এমন কিছু ইঙ্গিত রাখিয়া যান, যাহাতে একদিকে যেমন তাহাদের অতিপ্রাকৃতত্ব সূচিত হয়, অপরদিকে তেমনি প্রাণধর্মের সমগ্র চিত্রের সহিত তাহাদের একটি সামঞ্জস্য রাখিতে চেষ্টা করেন। যেখানে ইয়োরোপীয় চিত্রী তাহার সামঞ্জস্য খোঁজেন প্রাকৃত জীবনের মধ্যে, সেইখানে ভারতীয় চিত্রী তাঁহার সামঞ্জস্য খোঁজেন ধ্যানাহিত অন্তর্লোকের ঐক্যপরিস্পন্দের মধ্যে। বাহিরের সহিত কতটুকু মিলিল না মিলিল তাহা দেখিবার তেমন প্রয়োজন নাই, রেখাসন্নিবেশের দ্বারা তাহারা যদি সূচিত হয় তবেই যথেষ্ট। চিত্রী দেখিবেন যে তত্ত্বটি, যে রসটি, যে ভাবাবেশটি তিনি হৃদয়ে বিধারণ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে চিত্রে প্রকাশিত ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া সেই সামঞ্জস্যটি তাঁহার বা তদ্ভাবাভাবিত দর্শকের নিকট স্ফুট হইল কি না। তাই ভারতীয় চিত্রী

নিজের কোনও individuality বা ব্যক্তিগত জীবনের মতের বা বিশ্বাসের বা অনুরাগ-বিরাগের ছবি আঁকিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন না। সমগ্র দেশের চিত্তের মধ্যে, ধ্যানীর চিত্তের মধ্যে, সাধকের চিত্তের মধ্যে যাহা চিরন্তন সত্যরূপে জাগ্রত রহিয়াছে তাহাকেই মূর্ত করিয়া তুলিয়া তাহারই অন্তর্জাগরণের সাহায্য করিতে চিত্রী যত্নবান হইতেন। সৌন্দর্য আঁকা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল ধ্যানের মধ্যে যাহা প্রাণময় হইয়া রহিয়াছে সেই সত্যটিকে চিত্রের ভাষায় প্রাণময় করিয়া তুলিয়া লোকের নিকট উপস্থাপিত করা।

অনেকে মনে করেন যে ভারতীয় চিত্রপদ্ধতিতে প্রকৃতের অনুকরণের কোনও ধারণা ছিল না, কিন্তু একথা ঠিক নহে। চিত্র এবং নৃত্য এই উভয়কেই তাঁহারা একজাতীয় মনে করিতেন এবং উভয়কেই তাঁহারা প্রকৃতির অনুকরণ বলিয়া মনে করিতেন। নৃত্যের উৎপত্তিবিষয়ে বলিতে গিয়া 'বিষ্ণুধর্মোত্তর' পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে প্রলয়ের সময় ভগবান নারায়ণ বেদোদ্ধারের জন্য যে অনন্ত জলাশয়ে বিবিধ ভঙ্গিতে চংক্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতিতেই নৃত্যের উৎপত্তি। বোধহয় তাৎপর্য এই যে, যে সাবলীল প্রাণের ক্রিয়াতে সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং বিধৃত রহিয়াছে সেই প্রাণপরিস্পন্দন ব্যাপারেই ত্রৈলোক্যের স্বরূপ এবং সেই প্রাণব্যাপারের অনুকরণ। এইজন্যই নৃত্য এবং চিত্র উভয়কেই ত্রৈলোক্যের অনুকৃতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 'চিত্রসূত্রে' লিখিত আছে :

'যথা নৃত্যে তথা চিত্রে ত্রৈলোক্যানুকৃতিঃ স্মৃতা।
দৃষ্টয়শ্চ তথা ভাবা অঙ্গোপাঙ্গানি সর্বশঃ॥
করাশ্চ যে মহানৃত্যে পূর্বোক্তা নৃপসত্তম
ত এব চিত্রে বিজ্ঞেয়া নৃত্যং চিত্রং পরং মতম্॥'

তাৎপর্য এই, নৃত্য এবং চিত্র উভয়েতেই ত্রৈলোক্যের অনুকৃতি দেখা যায়। যে সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি অন্তরের নানাবিধ ভাব অঙ্গ ও উপাঙ্গের নানা সংস্থানবৈচিত্র্য ও হস্তাদির নানা বিক্ষেপক্রিয়ার কথা নৃত্যপ্রকরণে কথিত হইয়াছে চিত্রেও সেইগুলিই দেখাইবার চেষ্টা করা হয়। নৃত্যই শ্রেষ্ঠ চিত্র। নৃত্যকে শ্রেষ্ঠ চিত্র বলিবার তাৎপর্য বোধ হয় এই যে, সমগ্র জগৎময় শক্তির যে ক্রিয়ালীলা চলিয়াছে, বৃক্ষলতা তরুগুল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ইতরপ্রাণী, মনুষ্য ও দেবযোনির মধ্যে অন্তরের নানাবিধ ভাবের প্রস্ফুটনে ও তৎ-সহচরিত নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে, নানা প্রকার শরীরাবয়বের আকার ইঙ্গিতে, তাহার অভিব্যক্তির যে অজস্র ক্রীড়ালীলা চলিয়াছে, নৃত্যের গতিভঙ্গির দ্বারা তাহাকে যেরূপ প্রকাশ করা যায়, স্থিতিশীল চিত্রের মধ্যে তাহাকে সেরূপ প্রস্ফুটিত করা যায় না। নৃত্যকে শ্রেষ্ঠ অনুকৃতি বলাতে কী জাতীয় অনুকৃতিকে শ্রেষ্ঠ অনকৃতি প্রাচীনেরা বলিতেন তাহাও প্রকাশ পায়। কোনও নৃত্যের ভঙ্গির দ্বারা কোনও প্রাকৃতির বস্তুর যথাযথ দৃষ্ট স্বরূপের অনুকরণ সম্ভব নয়। একটি নর্তকী লতার ন্যায় ভঙ্গি করিলে তাহার মধ্যে একটি পদ্মলতার পাতা দেখা যাইবে না, ফুলও দেখা যাইবে না, ডাঁটাও দেখা যায় না; তবে নৃত্যকে কী হিসাবে অনুকৃতি

বলা যায়? একটি লতায়িত নৃত্যকে যদি লতার অনুকরণ বলিতে হয় তবে তাহাকে লতার জীবনের মধ্যে যে লাবণ্যময় স্বচ্ছন্দবাহী প্রাণশক্তির তরঙ্গায়িত রূপপ্রবাহ চলিয়াছে তাহারই অনুকরণ বলিতে হয়। নচেৎ কোনও নর্তকীকে লতা বলিয়া ভ্রম হইবার কথা নহে এবং সেরূপ অনুকরণ কোনও নৃত্যেই সম্ভব নহে। অতএব কোনও নৃত্যকে যদি ত্রৈলোক্যের অনুকৃতি বলা হয়, তবে ত্রৈলোক্যস্থ নানা বস্তুজাতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রাণপ্রদ ধর্মের অনুকরণ বলা যাইতে পারে। চিত্র ও নৃত্যকে যদি একজাতীয় অনুকরণ বলা যায় এবং নৃত্যকে যদি শ্রেষ্ঠ অনুকৃতি বলা হয়, তবে তাহা হইতে ইহাও প্রমাণিত হয় যে চিত্রের মধ্যে যে অনুকৃতি শিল্পীর লক্ষ্য ছিল তাহা বাহ্যস্বরূপের অনুকৃতি নয়, তাহা তাহার অন্তরের প্রাণপ্রদ ধর্মের অনুকৃতি। এই জন্যই ভারতীয় চিত্রে কেবলমাত্র শরীরসংস্থানের যথাযথ অনুকরণকে প্রধান স্থান দেওয়া হয় নাই, শরীর সন্নিবেশের দ্বারা বস্তুটিকে চিনিতে পারিলেই যথেষ্ট, চিত্রের যথার্থ লক্ষ্য ছিল প্রাণপ্রদ ধর্মের অনুকৃতির দিকে। অনেক কাব্যনাটকে দেখা যায় যে বিরহ বিনোদনের জন্য বিরহীরা তাহাদের নায়িকার চিত্র তাহাদের স্মৃতিভাণ্ড হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া আঁকিতেন। অথচ সে আঁকাও এমন হইত যাহা দেখিয়া লোকের মনে ভ্রম হইত যেন যথার্থ মানুষটি সম্মুখে রহিয়াছে। কোনও সময় এই আঁকা যথাযথ বর্ণসন্নিবেশের দ্বারা সংঘটিত হইত, কোনও সময়ে বা ইহা কেবলমাত্র রেখার দ্বারা অঙ্কিত হইত। কালিদাসের যক্ষ বলিতেছেন, "ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগে শিলায়াম্"; কিন্তু যদিও এইরূপ স্মৃতি হইতে চিত্র অঙ্কনের অনেক উল্লেখ সাহিত্যে পাওয়া যায়, তথাপি কাহাকেও সম্মুখে রাখিয়া চিত্র আঁকিবার কথা বড়ো একটা পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় যে, ইহার একটি বিশেষ অর্থ আছে। চিত্রতত্ত্বের একটি নিগূঢ় রহস্য এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি বুঝিবার একটি শ্রেষ্ঠ ইঙ্গিত ইহাতে পরিস্ফুট হইয়াছে। চিত্রী যে ছবি আঁকেন, তাঁহার উদ্দেশ্য এ নহে যে কেবল ইন্দ্রিয়দ্বারে যে রূপ, যে আকৃতি ভাসিয়া উঠে, তাহাকে তিনি রেখা বা রং-এর দ্বারা বা প্রস্তরের দ্বারা ফুটাইয়া তুলিবেন। বাহিরের রূপকে চিত্রী তাঁহার বুদ্ধির দ্বারা ও হৃদয়ের দ্বারা যেভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাই বস্তুর যথার্থ রূপ। সেই রূপ সম্বন্ধেই তিনি সচেতন। বুদ্ধির মধ্যে যে সমগ্রকে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, হৃদয়ের রসবৃত্তির অভিষেকে যাহা তাঁহার মধ্যে প্রাণময় হইয়া রহিয়াছে সেই অলৌকিক বিগ্রহকে লৌকিক রূপের পরিচ্ছদের মধ্যে পুনঃসৃষ্টি করাই শিল্পীর যথার্থ চাতুর্য। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের দৃষ্টিবিজ্ঞানের একটি মোটা কথা এই যে চক্ষুরিন্দ্রিয় বিষয়ক্ষেত্রে উপনীত হয় এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগ হইলে বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাবে তাহা তদনুরূপ বৌদ্ধরূপে পরিণত হয়, এই বৌদ্ধরূপ চেতনার অভিষেকে প্রাণময় হইয়া উঠে। কাজেই প্রত্যেক জ্ঞানক্রিয়ার মধ্যে একটি অভ্যন্তরীণ সৃষ্টি-প্রক্রিয়া রহিয়াছে। এই রূপটির বিশেষ তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে চিত্তকে ধ্যানের দ্বারা সমাহিত করিতে হয়। ধ্যানসমাহিত হইলেই সেই রূপের যথার্থ প্রাণপ্রদ ধর্ম সাক্ষাৎকৃত হয়। এই জন্য কোথাও কোথাও শিল্পীকে যোগী বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ব্রহ্মা যখন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন তিনি বহুত্বের ধ্যানে তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই

তপোগৃহীত বহু নামরূপময় জগৎ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। শিল্পীও তেমনি একটি একটি করিয়া বস্তুর অবয়ব আঁকিয়া তাহাদের যোগফলে সমগ্রের আঁকা শেষ করেন না। বাহ্যরূপ সহযোগে ধ্যানের মধ্য দিয়া তাঁহার চিত্তের মধ্যে সমগ্রের একটি যুগপৎ আবিষ্কার ঘটিয়া থাকে। এই সমগ্র বাহ্যের অনুরূপ হইলেও ইহার মধ্যেই সেই বাহ্যের যে প্রাণপ্রদ ধর্ম চিত্রীর হৃদয়কে বিব্রত করিয়াছে সেই ধর্মের প্রাচুর্যের দ্বারা সেই অন্তস্থ সমগ্রটি অভিষিক্ত হয়। এই দেশকালরহিত সমগ্রটিকে যখন চিত্রের দেশকালবন্ধনের মধ্যে চিত্রী বিধৃত করেন, তখন সেই সমগ্রের অনুপ্রাণনায় প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটি বিশেষ সামঞ্জস্য ও সার্থকতা লাভ করে। অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মূর্তি ও চিত্রই এই প্রণালীতে গঠিত বা অঙ্কিত হইয়াছে। যে বিরহী তাঁহার প্রণয়িনীর প্রতিকৃতি তাঁহার হৃদয় মন্থন করিয়া, তাহারই বর্ণে অঙ্কিত করিতেন, তাঁহার হৃদয়পটে প্রণয়িনীর সমগ্র রূপটি প্রেমরসে অভিষিক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিত, তিনি তাহাকেই রূপ দিয়া বাহিরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। সেইজন্য অনেক সময় দেখা যায় যে অন্য সকলে সুন্দর বলিলেও চিত্রীর মনে ক্ষোভ রহিয়া যাইত যে অন্তরে তিনি যে লাবণ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বাহিরের রেখা বা বর্ণবিন্যাসে তাহা তিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেন না :

'যদ্‌যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তৎ তদন্যথা।
তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্‌॥'

কোনও মানুষকে আঁকিতে গেলে কেবলমাত্র তাহার দেহকে প্রত্যক্ষ করিলে তাহাকে আঁকা যায় না। যাহারা কোনও মানুষকে মডেল রাখিয়া আঁকে, তাহারা বড়োজোর সেই মানুষের তাৎকালিক একটি ভাবমাত্রকে রূপ দিতে পারে, অথচ সেই ভাবটি হয়তো একটি অত্যন্ত অবান্তর ভাব এবং হয়তো তাহা তাহার প্রাণপ্রদ ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রতি মানুষের মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নানা ভাবের উদয় হয় ও বিলয় হয়। হয়তো এমন অনেক ভাবও উদিত হয় যাহা একান্ত অবান্তর এবং আগন্তুক, কিন্তু যে চিত্রী দেখিয়া আঁকে তাহার পক্ষে তাহার আঁকিবার সময়ে যে ভাবটিকে দেখিতে পায় বা অনুমান করে যে দেখিতে পাইল, সে তাহাকেই কোনও রকমে চিত্রের মধ্যে ধরিতে চেষ্টা করে। প্রত্যেক উদীয়মান ও বিলীয়মান ভাবের সঙ্গে মুখের অভিব্যক্তি, দৃষ্টির অভিব্যক্তি পরিবর্তিত হইতে থাকে। এই অজস্র পরিবর্তনের মধ্যে বাহ্যশিল্পী কোথায় যে তাহার দৃষ্টি রাখিবে তাহা খুঁজিয়া পায় না। কিন্তু যিনি যথার্থ ধ্যানশিল্পী তিনি সমগ্র প্রাণপ্রদ ধর্মের সহিত তাহার চিত্রের পুরুষকে গ্রহণ করেন বলিয়া বিভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া সেই পুরুষের যে একটি স্বাভাবিক সাম্য আছে সেই সাম্যের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিতে পারেন এবং সেইজন্য সেই পুরুষের কোনও একটি বিশেষ ক্ষণের ভাবকে অতি জাগ্রত না করিয়া সমগ্র ভাবের সামঞ্জস্যের সহিত সমগ্র মূর্তির সামঞ্জস্য গড়িয়া তুলিতে বা অঙ্কিত করিতে পারেন। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে যখন যে ভাব উঠে সেই অনুসারে তাহার মুখের আকার ও ইঙ্গিত তাহার চোখের ভাব, মুখের বর্ণ ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটে। শুধু তাহাই নহে প্রভাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে, এমন কি বোধহয় বিভিন্ন ঋতুতেও মানুষের মুখব্যঞ্জনায় নানা পরিবর্তন লক্ষিত হয়।

মানুষের মনোভাবের সহিত তাহার দেহসংস্থান ও মুখব্যঞ্জনার এমন একটি সম্পর্ক আছে যে কোনও ব্যঞ্জনা প্রকাশ করিব না অথচ একটি নিখুঁত মূর্তি আঁকিব বা মানুষের নিখুঁত সাদৃশ্য চিত্রে ফুটাইয়া তুলিব ইহা বোধহয় একরূপ অসম্ভব। এমন কি ফোটোগ্রাফিতে কোনও না কোনও প্রকারে আস্ফুট মনোভাব চিহ্নিত হয়।

চিত্রে বা ভাস্কর্যে realism ও idealism-এর যে দ্বন্দ্ব অষ্টাদশ শতকে ও ঊনবিংশ শতকে Zola, Courbet, Corot প্রভৃতিরা তুলিয়াছিলেন তাহার অনেকখানি idealism কথার অর্থ উলটা করিয়া বুঝিবার জন্য। Realism-বাদের প্রতিশ্রুতি ছিল এই, তাঁহারা যথাস্থিত-বাদী এবং সকল বস্তু এবং প্রাণীকে যথাস্থিতভাবে অঙ্কিত করিবেন। তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রের বাহিরে সেই চিত্রের আর কোনও অর্থ থাকিবে না। কিন্তু কোনও মানুষের চিত্র আঁকিতে হইলে শুধু তাহার শরীরটি আঁকা যায় না, শরীর ছাড়াইয়া তাহার মনেরও খানিক অংশ তাহার মধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়ে। কথিতও আছে যে একসময়ে Corot-এর যৌবনে তাঁহাকে একটি প্রকাণ্ড কুৎসিত গুদাম ধরনের বাড়ি আঁকিতে দেওয়া হইয়াছিল। মালিকের ইচ্ছা অনুসারে তিনি সেই বাড়িটি যথাযথভাবে আঁকিলেন, কোথাও কিছু বাকি রাখিলেন না, কুৎসিত চৌকা জানালাগুলি পর্যন্ত যেমন ছিল তেমনি আঁকিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এমন আলোছায়ার খেলা দেখাইলেন যাহার দ্বারা সেই বিশ্রী বাড়িটার মধ্যেও যেন একটি অলৌকিক দ্যোতনা ফুটিয়া উঠিল। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে যথাস্থিত বস্তুকে আঁকিতে গেলেও আলোছায়ার বিন্যাসে কী স্থানবিন্যাসবৈচিত্র্যে সেই যথাস্থিত বস্তুটির চিত্র প্রাকৃত বস্তু হইতে আর একটি নূতন পদবি লাভ করে। এই চিত্রটি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া Roger Fry বলিতেছেন : 'He did the protrait so as to give complete satisfaction to the owner, leaving out no detail of all the dull square windows; he gave fully every architectural common-place; he did the iron railing of the entrance full justice; but, without interfering with his patron's satisfaction in all this, he found an entirely unexpected and exquisite harmony of colour between the sunlit surface of the ugly building and the luminous sky behind, he disposed the cast shadow in the foreground and chose the proportions of everything relatively to his canvas so adroitly that he created a moving spiritual reality out of an incredibly boring suburban scene.' (*Transformations,* P. 37.) Rembrandt-এর 'Boy at lessons' ছবিখানিতে একটি কিশোর বালক কাগজপত্র কেতাব সঙ্গে লইয়া সামনে একটি ডেস্কের উপর রাখিয়া ডানহাতে কলমটি লইয়া বুড়া আঙুলটি থুতনির উপর চাপিয়া ধরিয়া যেন শূন্যমনে বসিয়া কী ভাবিতেছে। ছবিখানির মধ্যে জীবন্ত একটি ছেলের মূর্তি প্রস্ফুট হইয়াছে। এই হিসাবে চিত্রটিকে একটি আদর্শ-যথাস্থিতিক (realistic) চিত্র বলা যাইতে পারে। এক হিসাবে বলিতে গেলে ইহা অপেক্ষা যথাস্থিতিক চিত্রের উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেওয়া যায় না। কিন্তু সমস্ত চিত্রের উপর আলোছায়ার খেলা এমনভাবে খেলিয়া গিয়াছে যে তাহা দেখিলেই চিত্রিত বালক ও তাহার ডেস্কটি ছাড়িয়া আমাদের মন যেন Rembrant-এর যে

ধ্যানগহনে ওই মূর্তিটি বিধৃত হইয়াছিল তাহার মধ্যে প্রবেশ করে এবং চিত্রিত বিষয়টি অনেক পিছনে পড়িয়া থাকে। একটি যথাস্থিতিক চিত্রের মধ্য দিয়া Rembrandt তাঁহার ধ্যানলোকের স্পর্শ দেখাইয়াছেন, অথচ কোনও অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক বিষয়ান্তরের ইঙ্গিত নাই। এই ছবি সম্বন্ধে Roger Fry বলিতেছেন : 'This is a plain flat board of wood, but one that has been scratched, battered and rubbed by schoolboys' rough usage. Realism, in a sense, could go no further than this, but it is handled with such a vivid sense of its density and resistance, it is situated so absolutely in the picture-space and plays so emphatically its part in the whole plastic scheme, it reveals so intimately the mysterious play of light upon matter that it becomes the vehicle of a strangely exalted spiritual state, the medium through which we share Rembrandt's deep contemplative mood. It is miraculous that matter can take exactly the impress of spirit as this pigment does. And that being so, the fact that it is extraordinarily like a schoolboy's desk falls into utter insignificance beside what it is in and for itself. Perhaps it is a mere accident, but it is a fortunate and symbolic accident that this particular piece of matter could be paid for to-day not at the price of the original wood but at many times the value of so much gold.' (Ibid, pp. 40-41).

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, যথাস্থিতিক চিত্রেও কেবলমাত্র চিত্রিত বিষয়ের অন্তরের অভিব্যক্তি হয় তাহা নহে, শিল্পীরও ধ্যানগ্রহণের রূপ তাহার মধ্যে ধরা পড়ে। এমন উৎকৃষ্ট চিত্র অতি অল্পই আছে যেখানে চিত্রিত বস্তু ছাড়িয়া চিত্ত অন্যত্র ধাবিত হয় না। Courbet-এর একটি চিত্রের ('Blonde en dormic') সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে চিত্রটি যথাস্থিতিক হইয়াছে, কিন্তু এ চিত্রটি দেখিলেও Courbet যে model লইয়া ছবিটি আঁকিয়াছিলেন সেই যথাস্থিত বস্তুর কথা একবারও আমাদের মনে হয় না। বর্তুলতার ভাষায় (plastic terms) ও স্থানসন্নিবেশের সম্মিলনে চিত্রের বিষয়টিকে এমন করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, যে চিত্রকে ছাড়িয়া চিত্রের বাহিরের যে বস্তুর তাহা অনুকৃতি তাহার দিকে আমাদের মন ধাবিত হয় না। চিত্রের সহিত Courbet-এর কল্পনাগত রূপের এমন তাদাত্ম্য সম্বন্ধ রহিয়াছে যে চিত্রও কল্পনার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে। চিত্র দেখিতে দেখিতে আমরা Courbet-এর কল্পনার মধ্যেই যেন ভাসিয়া বেড়াই। কাহার অনুকৃতি, সে অনুকৃতি যথার্থ কি না সে প্রশ্ন কখনও আমাদের মনের মধ্যে উদিত হয় না। এই জন্যই আমাদের বাধ্য হইয়া বলিতে হয় যে যথাস্থিতিক শিল্পের মধ্যেও কেবল যথাস্থিতিকতা থাকে না, তাহার মধ্যে তদতিরিক্ত আরও কিছু গূঢ় তাৎপর্য থাকে।

Richardes তাঁহার *Principles of literary criticism*-এ বলিয়াছেন যে বীক্ষাবস্থা বা aesthetic stage বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র মানসিক অবস্থা নাই। তিনি আরও বলেন যে সাধারণ জ্ঞানগত যে সব অনুভূতি আমাদের ঘটে, বৈক্ষিক অনুভূতিও তৎসজাতীয়। কেবলমাত্র সাধারণ অনুভূতিরই একটা বিশেষ পরিণামে বৈক্ষিক অবস্থা উৎপন্ন হইতে

পারে, কিন্তু ওই বৈক্ষিক অবস্থার কোনওরূপ বিশেষত্ব বা নবীনতা নাই। প্রাতঃকালে বেশ পরিবর্তনের সময় যেরূপ মনোবৃত্তি ঘটে, এবং একটি কবিতা বা সংগীত শুনিবার সময় যে মনোবৃত্তি ঘটে, এই উভয়ের মধ্যে কোনওরূপ পার্থক্য নাই। উভয়ের মধ্যে কেবল একটি প্রকারগত ভেদমাত্র আছে : 'But a narrorwer sense of aesthetic is also found in which it is confined to experiences of beauty and does imply value. And with regard to this, while admitting that such experiences can be distinguished I shall be at pains to show that they are closely similar to many other experiences, that they chiefly differ in the connections between their constituents and that they are only further development, a finer organisation of ordinary experiences and not in the least a new and different kind of thing. When we look at a picture or read a poem or listen to music we are not doing something quite unlike what we were doing on our way to the Gallery or when we dressed in the morning. The fashion in which the experience is caused in us is different and as a rule the experience is more complex and if we are successful, more unified. But our activity is not of a fundamentally different kind.' (P.16). বীক্ষাবস্থার মধ্যে কিছু অলৌকিকতা আছে কি না, সে সম্বন্ধে আমরা এখানে কোনও বিচার করিব না। এইটুকু আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি, কেবলমাত্র ঐন্দ্রিয়জ ধর্মের মধ্যে নানারূপাদির বা শব্দাদির মধ্যে যে সম্বন্ধ সংঘটিত হয়; তাহার দ্বারা বৈক্ষিক অবস্থা সংঘটিত হইতে পারে না। বহির্গৃহীত রূপাদির সহিত অন্তঃস্থিত নানা সম্পর্কজালের সহিত একটি বিশেষ সম্পর্ক না ঘটিলে, কতগুলি ভাবপরম্পরা উদ্রিক্ত না হইলে কেবলমাত্র ঐন্দ্রিয়ক প্রীতির ফলে সৌন্দর্যবোধ ঘটে না। যে বস্তুকে দেখিয়া আমরা সুন্দর বলি তাহা আমাদের মধ্যে একটা বিশিষ্ট জাতীয় ভাব উদ্রিক্ত করে, এবং সেই বিশিষ্ট জাতীয় ভাবটি যে কোনও প্রকারের শিল্পজাতীয় বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় (সংগীত কী কাব্য, কী ছবি, কী ভাস্কর্য ইত্যাদি) এবং অন্যজাতীয়, হইতে উৎপন্ন হয় না। অর্থাৎ শিল্প হইতে যে সৌন্দর্যবোধ উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে নানা বৈচিত্র্য থাকিলেও এমন একটি বিশিষ্ট সাজাত্য আছে যাহাতে তাহাকে অন্যবিধ বোধ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য করা যায়। এই বিষয়ে Roger Fry তাঁহার 'Vision and design' প্রবন্ধে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার *Transformations* গ্রন্থেও তিনি লিখিয়াছেন যে— 'Whenever we say that work of art is beautiful we imply by that statement that it is of such a kind as to produce in us a certain positive response, and that if we compare in our minds responses experienced in turn in face of different works of art of the most diverse kinds—as, for instance, architectural, pictorial, musical or literary—we recognise that our state of mind in each case has been of a similar kind, we see in all these different experiences a general similarity in our attitude, in the pattern of our mental dispostion and further that the attitude common to all these experiences is peculiar to them and is clearly distinguishable from our mental attitude in other experiences,' (p. 1.)

আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে যদিও প্রায় সমস্ত সুন্দর বস্তু দর্শনের সঙ্গে এবং সুন্দর সংগীত শ্রবণের সঙ্গে আনন্দ অনুস্যূত থাকে এবং এই আনন্দবোধের সহিত ইন্দ্রিয়জ রূপশব্দাদির ধর্ম জড়িত থাকে তথাপি বহির্গত ঐন্দ্রিয়ক বস্তু আমাদের অন্তরের মধ্যে যে নানা প্রকারের সাড়া স্পন্দন বা ব্যঞ্জনা উদ্রিক্ত করে তাহারই সহিত আমাদের পরিচয়ের যে সামঞ্জস্য ঘটে তাহাতেই সৌন্দর্য বোধ উৎপন্ন হয়। Roger Fry যদিও এই পরিচয়ের স্বরূপটি নির্ণয় করিতে পারেন নাই তথাপি তিনি এটুকু বুঝিয়াছিলেন যে সৌন্দর্য বা রমণীয়কতা ঐন্দ্রিয়ক নহে, এবং তাহা আমাদেরই আন্তরিক কোনও বিশিষ্টজাতীয় অন্তরুদ্রেকের ফল। Roger Fry বলিতেছেন : 'In all cases our reaction to works of art is a reaction to a relation and not to sensations or objects or persons or events. ....Our emotional reactions are not about sensations.' (p.3)

.... 'It is true that in nearly all works of art agreeable sensations form the very texture of the work. In music, pleasurable quality of sound is the object of deliberate research, but it is by no means evident that this is essential. Some effects of modern music suggest that relations of mere noises, not in themselves agreeable, can arouse aesthetic pleasure and many great composers have worked in sound textures which were generally proclaimed as harsh and disagreeable. If it be said that though disagreeable to the audience they had been found agreeable by the composer, we are none the less faced with the fact that his contemporaries did after all accept his work for its aesthetic quality even while the sound texture appeared unpleasing, although under stress of that aesthetic satisfaction the unpleasure gradually changed to pleasure' (p.4). তাৎপর্য এই যে কর্কশ স্বরের বিন্যাসেও একটি রমণীয় সুরলহরী নির্মাণ করা যায়, রমণীয়তা বা সৌন্দর্য সুখের ব্যাপ্য ধর্ম নহে, অর্থাৎ যেখানে রমণীয়তা বা সৌন্দর্য বোধ থাকিবে সেইখানেই যে সুখবোধ থাকিবে এমন বলা যায় না; যদিও রমণীয়তা হইতে ক্রমশ সুখবোধ উৎপন্ন হইতে পারে। জগন্নাথ তাঁহার 'রসগঙ্গাধর'-এ বিশিষ্ট চমৎকারিত্বকে কাব্যত্বের প্রযোজক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'স্ববিশিষ্টজনকতাবচ্ছেদকার্থপ্রতিপাদকতাসংসর্গেণ চমৎকারত্ববত্ত্বমেব বা কাব্যত্বম্'। এখানে তিনি স্পষ্টই বুঝয়াছিলেন যে সৌন্দর্যের মধ্যে আহ্লাদ ছাড়া আর একটি বিশেষ মনোভাব আছে যাহা সৌন্দর্যের প্রযোজক, তাহাকেই তিনি চমৎকারস্বরূপে নির্দেশ করিয়াছেন এবং এই চমৎকারত্বকে একটি লোকোত্তর অনুভব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোনও একখানা ছবি দেখিলে শিশুরা তাহার বর্ণের মনোহারিত্বে মুগ্ধ হইতে পারে, কিন্তু বিবেচক চিত্রানুরাগীরা রং দেখিয়া তুষ্ট হয় না, রংগুলির পরস্পর সম্পর্কে যে অপূর্বতা ও চমৎকারিতা হয় তাহা দেখিয়াই চিত্রের প্রশংসা করেন। এই জন্যই এই চমৎকারিত্বকে সৌন্দর্যগত বিশেষ মনোভাব বলিয়া বলা যায়। ইংরাজিতে বলিতে গেলে এই চমৎকারিত্বই যথার্থ aesthetic state। এই চমৎকারিত্বের প্রযোজক হিসাবে ব্যক্ত বা অব্যক্ত হিসাবে অনেক জাতীয় ভাবপুঞ্জ বা চিন্তাপুঞ্জ খেলা করিতে পারে, এবং চমৎকারিত্ব বিশ্লেষণ করিতে

পারিলে উৎপাদকতাবচ্ছেদকের মধ্যে সেরূপ অনেকগুলিরও স্বরূপ ধরা পড়িতে পারে, কিন্তু তথাপি এই চমৎকারিত্বকে একটি বিশিষ্ট ফলীভূত অবস্থা বলিয়া না মানিয়া উপায় নাই; এবং এই হিসাবে প্রযোজক বৃত্তিগুলির লৌকিকতা স্বীকার করিলেও ফলীভূত চমৎকারিত্বের অলৌকিকতা স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু প্রযোজকীভূত বৃত্তিগুলির মধ্যে এই চমৎকারিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না।

কোনও একটি চিত্রের বৈশিষ্ট্য বিচার করিতে গেলে আমরা এই বিশিষ্ট চমৎকারিত্বের পরিচয় পাই। কোনও ছবির কোনও বৃহৎ চিত্তাকর্ষী আখ্যান থাকিতে পারে কিংবা নাও থাকিতে পারে। কোনও একটি চিত্র কেবল কালিকলমের রেখায় আঁকা হইতে পারে, কিংবা বর্ণসংঘট্টে সুচারুরূপে চিত্রিত হইতে পারে, কোনও চিত্রে আখ্যানভাগের বৈশিষ্ট্য, বর্ণ ও আকারবিশেষের বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম না করিতে পারে; এসমস্তের কোনওটির দ্বারাই চিত্রের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয় না। কোনও একটি চিত্রকে art হিসাবে বড়ো বলিতে হইলে দেখিতে হইবে যে তাহার সমগ্রের দ্বারা একটি সমগ্র স্ফুট চৈত্তিক অবস্থা উৎপন্ন হইল কি না। সেই সমগ্র স্ফুট চৈত্তিক অবস্থা যদি উৎপন্ন হয়, তবে তাহা অবয়বগত বর্তুলাকার দ্বারা সম্পন্ন হইল কি স্থানবিনিবেশের চাতুর্যের দ্বারা সম্পন্ন হইল, কি রেখাবিনিবেশের দ্বারা সম্পন্ন হইল, কি আলোছায়ার সংমিশ্রণে, কি বিবিধ রং-এর খেলায় সম্পন্ন হইল তাহা লইয়া বাদ বিসংবাদের প্রয়োজন নাই। —'Provided that surprising, vivid and consistent suggestions of a peculiar psychological entity are given to us we need not clamour for significant plasticity. One can imagine a case where a few disjointed dots and dashes suggesting the glance of an eye, or the curve of a mouth would produce the effect without even the suggestion of a plastic volume. And even if, as is more usual, plasticity is given it will be used generally to support or underline the psychological impressions'. (*Transformation,* p.11) যে ছবিতে কেবলমাত্র বর্তুলধর্ম বা স্থানবিনিবেশের বৈচিত্র্যকে (plastic and spatial characters) প্রধান স্থান দেওয়া হয় এবং তাহার ফলে সেই চিত্রের অতিরিক্ত কোনও চৈত্তিক ভাবচমৎকৃতি ফুটিয়া উঠে না, সেই চিত্রকে উৎকৃষ্ট চিত্র বলা চলে না। Roger Fry অনেকগুলি চিত্রের সমালোচনা করিয়া এই তত্ত্বটি স্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। Daumiere-এর Gare St. Lazare চিত্রটি বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলিতেছেন : 'So all the time we have been entirely forgetting plastic and spatial values. We have, through vision plunged into that spaceless moral world which belongs characteristically to the novel and we can hardly help noting, by the way how distinct this state of mind is from that with which we began'. Daumiere-এর এই চিত্রে বর্তুলাকার স্থানসন্নিবেশ ও আলোছায়ার সন্নিপাত যেভাবে করা হইয়াছে, তাহা যে সম্পূর্ণভাবে চিত্রোৎপাদিত চৈত্তিক অবস্থার অনুকূল আচরণ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। যেখানে উভয়ের সম্পূর্ণ সহযোগিতা থাকে, (যেমন Rembrandt-এর Boy at Lessons-এর

চিত্রে) সেখানে কিছু বলিবার নাই; কিন্তু তাহা না হইয়াও যেখানে শিল্পী কোনও জড়বস্তুর উপর তাহার চিত্তবৃত্তির বা ধ্যানধৃতরূপের বা কোনও গভীর বেদনার এমন ছাপ রাখিয়া দিতে পারে, যাহাতে সেই জড়বস্তু আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার অভিব্যঞ্জন করিতে পারে, বাহিরের লৌকিক অবস্থাপেক্ষী না হইয়া অলৌকিক হৃদয়ভাবকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে সেইখানে শিল্পীর শিল্পশ্রম সার্থক হয়।

ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি যে মানুষের মধ্যে নিরন্তর নানা ভাবতরঙ্গ খেলিয়া বেড়ায়,—সাধারণত শিল্পীরা তাহারই কোনও একটি অবস্থাবিশেষকে অঙ্কিত করিতে বা মূর্তি দিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। একটা ঐতিহাসিক চিত্র আঁকিতে গেলে একটি বিশেষ অবস্থাকে মনের সঙ্কল্পের মধ্যে আনিয়া তাহাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ Rembrandt-এর ‘Christ before the Pilate’ ছবিখানির মধ্যে দেখা যায় যে বিচারক প্রধান স্থানে বসিয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহার সম্মুখে আসিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে নানাপ্রকার মুখভঙ্গির সহিত ইহুদি পুরোহিতেরা জিশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেছে। জিশুখ্রিস্টের ঠিক সম্মুখে প্রকাণ্ড স্তম্ভের উপর Caesar-এর বিশাল মূর্তি, আর সৈন্যপরিবেষ্টিত হইয়া দূরে একটি কোণে লাঞ্ছিত অবস্থায় অর্ধ অন্ধকারের মধ্যে জিশুখ্রিস্ট দাঁড়াইয়া আছেন। Rembrandt সমস্ত ঘটনাটি পর্যালোচনা করিয়া এই একটি বিশেষ ক্ষণকে কল্পনা করিয়া তাহাকেই চিত্রে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় শিল্পীরা অনেক সময় যে সমস্ত মূর্তি আঁকিতেন, বিশেষত বুদ্ধের, কোনও বোধিসত্ত্বের বা কোনও দেবদেবীর মূর্তি যখন আঁকিতেন তখন তাঁহারা কোনও বিশেষ একটি ভাবের মূর্তিকে না আঁকিয়া বিভিন্ন জাতীয় ভাবের সহিত সামঞ্জস্যে যে একটি বিশেষ ভাবকে ধ্যানস্পন্দে প্রত্যক্ষ করিতেন তাহাকেই রূপ দিতে চেষ্টা করিতেন। এইজন্য সেই সমস্ত মূর্তিতে কোনও বিশিষ্টক্ষণের কোনও বিশিষ্ট ভাব ধরা পড়ে না এবং সেই হিসাবে প্রাকৃতিক ভাবের যথাস্থিতিকত্ব (realistic) হয় না। অথচ নানা বিশেষ ভাবের মধ্যে তাহাদেরই নানাপ্রকার সহযোগ পরম্পরায় যে একটি অবিনাশী বুদ্ধমূর্তি বা বোধিসত্ত্বমূর্তি শিল্পীর সংকল্পগোচর হয় তাহাকেই তিনি রূপ দিয়া থাকেন। এমন কি অনেকগুলি মূর্তি লইয়াও যখন একটি সমবেত সৃষ্টি করা হইত, তখনও একথা বলা চলে না যে তাঁহারা পৃথক পৃথক ভাবে প্রত্যেক মূর্তিকে একটা স্বতন্ত্রতা দিয়া সেইগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া পার্থক্যের ও স্বাতন্ত্র্যের পরম্পরানুকূলতায় বা পরস্পর প্রতিস্পর্ধিতায় যে সামঞ্জস্য ঘটে সেইজাতীয় সামঞ্জস্যকে প্রস্ফুট করিতে চেষ্টা করিতেন। Rembrandt-এর যে ছবিখানার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে Pilate প্রভৃতি পুরোহিতেরা, সৈনিকেরা, জিশুখ্রিস্ট এবং Caesar-এর প্রকাণ্ড মূর্তি সকলেই আপন আপন পৃথক পৃথক অভিনয় করিয়া যাইতেছেন। সেই অভিনয়ের যৌগপদ্যে তাৎকালিক একটি ক্ষণের বিচারদৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু চিত্রী এমন কোনও বিশিষ্ট চৈত্তিক অবস্থা দ্যোতিত করিতে চেষ্টা করেন নাই, যাহার অভাবে চিত্রের প্রত্যেকটি মূর্তি অভিভূত হইয়াছে। চিত্রের মধ্যে কাহার যে প্রাধান্য বা কি ভাবের প্রাধান্য তাহা বলা যায় না। পৃথক পৃথক মূর্তিগুলির পরস্পর দ্বন্দ্বে ও

প্রতিযোগিতায় একটি ক্ষণের একটি সমগ্র অবস্থা দ্যোতিত হইয়াছে। ভারতীয় বহু পুরুষ সমন্বিত কোনও একটি প্রসিদ্ধ শিল্প আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সেখানে একটি কোনও বিশেষ ভাবই অঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্য সমস্ত ভাবের মূর্তিগুলি তাহারই অনুকূলতায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। নানা রস যে এক রসকে স্ফুরিত করিবার জন্য আবশ্যক হয় এবং ওইখানেই যে নানারসের সার্থকতা এইটিই ছিল ভারতীয়দের বিশেষ লক্ষ্য। তথাপি ভারতীয় সমস্ত চিত্রের সম্বন্ধেই যে একথা বলা চলে তাহা নহে। ইয়োরোপীয়দের হইতে ভারতীয়দের এইখানেই একটি বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়াই এই বিশেষ ধর্মটির উপর একটু অতিরিক্ত জোর দিয়া বলা হইল।

সাঁচিস্তূপের দ্বারচিত্রের মধ্যে প্রকৃতির অতি সুন্দর অনুকৃতি দেখা যায়। ইহাতে ক্ষোদিত হরিণ হাতি প্রভৃতির মধ্যে প্রাকৃতিক অনুকৃতি সফল হইয়াছে। বোধ হয় এইগুলির মধ্যে অতি প্রাচীনযুগের ভারতীয় চিত্রকলার অবশেষ দেখা যায়। এই সাঁচিচিত্রের মধ্যেই বৃক্ষসংলগ্না একটি যক্ষিণী মূর্তির যৌবনধর্ম যেন বৃক্ষের যৌবনের সহিত তুলিত করিয়া গড়া হইয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত চিত্রের অনেকগুলিতেই স্বাভাবিক সাদৃশ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। যদিও আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে স্বাভাবিক সাদৃশ্য দেখানো হিন্দু শিল্পপদ্ধতির কোথাও উদ্দেশ্য ছিল না। তথাপি সাধারণ মনুষ্য বা ইতর প্রাণীর চিত্র আঁকিতে গেলে সর্বাঙ্গসাদৃশ্য দেখানো যে তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্যস্থল থাকিত তাহা আমরা শিল্পশাস্ত্রের বর্ণনা হইতেও দেখিতে পাই। শিল্পরত্নগ্রন্থে ৪৬ অধ্যায়ে চিত্রলক্ষণ প্রস্তাবে লিখিত আছে :

> 'জঙ্গমা বা স্থাবরা বা যে সন্তি ভুবনত্রয়ে।
> তৎ তৎ স্বভাবতস্তেষাং করণং চিত্রমুচ্যতে॥
> তচ্চিত্রং তু ত্রিধা জ্ঞেয়ং তস্য ভেদোঽধুনোচ্যতে।
> সর্বাঙ্গদৃশ্যকরণং চিত্রমিত্যভিধীয়তে॥'

চিত্রের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল চোখে যেমন দেখা যায় সে রকম আঁকিয়া দেখানো। সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের চক্ষুবিজ্ঞান সম্বন্ধে যে আলোচনা আছে তাহাতেও প্রধানত সকল প্রকার দৃশ্যমান বস্তুরই বহিঃসত্তা অঙ্গীকার করা হইত। বেদান্তমতে রজ্জুতে যেখানে সর্পভ্রম ঘটিত, বা মরীচিকায় জলভ্রম হইত, সেখানেও একটি মিথ্যা সর্প বা মিথ্যা জল বাহিরে সৃষ্ট হইত বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে। সেই বহিঃসৃষ্ট মিথ্যা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান জন্মিত। বোধ হয় এই জন্যই চিত্রানুকৃতির সময়ও শিল্পীদিগের নিকট এই দাবি করা হইত যে, যাহা চক্ষুতে দেখা যায় তাহারই অনুকৃতি যখন চিত্রীর উদ্দেশ্য, তখন চিত্রের সমস্ত বস্তুকেই চিত্রীকে অঙ্কিত করিতে হইবে। কোনও একটি মূর্তির কেবলমাত্র মাথা দেখাইলে সেই মাথা হইতে অবয়বের সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা দর্শন নহে— অনুমান। এই জন্যই শ্রীকুমার শিল্পরত্নে লিখিয়াছেন: 'সর্বাঙ্গদৃশ্যকরণং চিত্রমিত্যভিধীয়তে', অর্থাৎ সমস্ত অঙ্গকেই দৃশ্য করিতে হইবে। সেই জন্যই স্থানবিনিবেশসূচক perspective-

এর জ্ঞান থাকিলেও আমাদের দেশের শিল্পীরা দূরত্বজ্ঞাপন করার যে সমস্ত কৌশল আছে সে সমস্ত কৌশল অনেকসময় চিত্রে ও ভাস্কর্যে ব্যবহার করিতেন না,—এবং পৃথক পৃথক চিত্রফলকে একই plane-এ দূরের এবং নিকটের বস্তু পৃথক পৃথক করিয়া দেখাইতেন। perspective-এর যে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল তাহা চিত্রসম্বন্ধীয় অনেক বর্ণনা এবং অজন্তার কোনও কোনও চিত্র এবং চিত্রশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করা যায়। চিত্রসূত্রে লিখিত আছে : 'সুপ্তং চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জিতম্। নিম্নোন্নতবিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ।' অর্থাৎ যে চিত্রী নিদ্রিতকে নিদ্রিতের ন্যায় আঁকিতে পারে, চেতনাবানকে সচেতনের ন্যায়, মৃতকে মৃতের ন্যায়, চৈতন্যহীনকে চৈতন্যহীনের ন্যায়, উচ্চ স্থানকে উচ্চ স্থানের ন্যায়, নিম্ন স্থানকে নিম্ন স্থানের ন্যায় ও একটি যে অপরটি হইতে বিভক্ত হইয়া আসিতেছে তাহাকে চিত্রে ফুটাইয়া তুলিতে পারে তাহাকে চিত্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে। এইসঙ্গে ইহাও কথিত আছে যে, চিত্রে যে সমস্ত মূর্তি প্রদর্শন করা হইবে সেইগুলিকে তাহাদের পরস্পরের সহিত যে সম্বন্ধ তাহারই আনুলোম্যে আঁকিতে হইবে; অর্থাৎ কেহ যদি কাহারও দিকে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়া কথা বলে,— কেহ যদি পাশ ফিরিয়া থাকে তবে সেই প্রকৃত অবস্থার আনুলোম্যেই সেগুলি অঙ্কিত করিতে হইবে। সকলেই যেন চিত্রীর দিকে চাহিয়া আছে এরূপ করিয়া আঁকিলে চলিবে না। এই রকম বিবৃত্ত বা পার্শ্ববর্তী ভাবে নানা ভঙ্গিতে ছবি আঁকিতে গেলে খানিকটা পরিমাণে দৈশিক অবস্থা বিন্যাসের (perspective) বোধ না থাকিলে আঁকা যায় না। এই সম্বন্ধে চিত্রসূত্র বলিতেছে : 'এতেষাং খলু সর্বেষামানুলোম্যং প্রশস্যতে। সম্মুখত্বমথৈতেষাং চিত্রে যত্নাদ্ বিবর্জয়েৎ॥' চিত্রীরা কেবলমাত্র যে সুবর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লোহা, শিলা ও দারুর মূর্তি করিতেন বা কেবল রং দিয়া ছবি আঁকিতেন তাহা নহে, অনেকে এমন ছিলেন যাঁহারা মুহূর্তমধ্যে বায়ুবেগে কেবলমাত্র কয়েকটি রেখা দ্বারা প্রতিকৃতি আঁকিতে পারিতেন,—তাঁহাদিগকে বলা হইত মত্তচিত্রবিৎ।—'বায়ুগত্যা লিখেদ্ যস্তু বিজ্ঞেয়ো মত্তচিত্রবিৎ।' ইহা ছাড়া নানা প্রকারের বস্ত্রে ও কুড্যভিত্তিতে চিত্র আঁকিবার বিধি ছিল।

অনেকের ধারণা আছে, যে আমাদের দেশের চিত্রীদের অবয়ব প্রমাণ সম্বন্ধে কোনও যথাযথ জ্ঞান ছিল না। এ ধারণাটি যে ভ্রান্ত তাহা চিত্রসূত্র পড়িলে সহজেই বুঝা যায়। প্রমাণের মাত্রাকে (unit) তাল বলা হইত। মাথার পরিমাণকে আদিমাত্রা বা আদিতাল বলিয়া ধরা হইত। ভারতীয় শিল্পীরা মনে করিতেন যে সমগ্র দেহের সহিত মাথার এমন একটি সম্পর্ক আছে যে মাথার আকারের বিশিষ্ট ভগ্নাংশের পরিমাণের দ্বারা বা গুণকের পরিমাণদ্বারা সমগ্র অবয়বের পরিমাণ করা যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে Leonardo da Vinci (১৪৪৫ খ্রিঃ অব্দ) তাঁহার *A Treatise on Painting* গ্রন্থে ঠিক এই মতই পোষণ করিয়াছিলেন : 'A man has the length of two heads from the extremity of one shoulder to the other'. (p. 5) এমনই করিয়া তিনি অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিতও মাথার সম্বন্ধ দেখাইয়া তাহাদের পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন। আমাদের চিত্রসূত্রে পাঁচ জাতীয় মনুষ্যের কথা উল্লেখ আছে। হংস, ভদ্র, মালব্য, রুচক ও শশক। ইহাদের মধ্যে

হংসই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘতম ও শশকই সর্বাপেক্ষা হ্রস্বতম। বরাহমিহিরে এই বিভাগের কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। সেখানে হংস, শশ, রুচক, ভদ্র ও মালব্য যথাক্রমে দীর্ঘ ও হ্রস্ব বলিয়া গণিত হইয়াছে। পুরুষ প্রমাণ সম্বন্ধেও এই উভয়ের গ্রন্থে বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। চিত্রসূত্রে সর্বাপেক্ষা দীর্ঘতম হংসকে ২০৮ আঙুল বলিয়া বলা হইয়াছে এবং তাহার পর ভদ্র ১০৬ অঙ্গুলি, মালব্য ১০৪ অঙ্গুলি, রুচক ১০০ অঙ্গুলি ও শশকে ৯০ অঙ্গুলি বলা হইয়াছে। কিন্তু বরাহ-মিহিরে হংস ৯৬ ও শশ, রুচক, ভদ্র ও মালব্যকে তিন অঙ্গুলি কম বলিয়া বলা হইয়াছে। চিত্রসূত্রে কথিত আছে যে মানুষের মাথা দ্বাদশাঙ্গুলি। এক অঙ্গুলিতে ১ $\frac{১}{৩}$ ইঞ্চি। এই দ্বাদশাঙ্গুলিতে একটি তাল। জঙ্ঘা দুই তাল—উরু দুই তাল, পেট হইতে নাভি এক তাল, নাভি হইতে হৃদয় একতাল, হৃদয় হইতে কণ্ঠ একতাল, কণ্ঠ তাল-ত্রিভাগ। কর একতাল, বাহু সপ্তদশাঙ্গুলি, কর্ণ দুই অঙ্গুলি, ললাট চারি অঙ্গুলি বিস্তার ও দৈর্ঘ্য অষ্ট অঙ্গুলি। এইরূপে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাথার পরিমাণে পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই পরিমাণের সহিত Leonardo da Vinci-র প্রদত্ত প্রমাণের সহিত বিশেষ সামঞ্জস্য দেখা যায়। অবশ্য পঞ্চজাতীয় মানুষের মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাণ তাহার মাথার পরিমাণের সাদৃশ্যে বিভিন্ন প্রকার হইবে। স্ত্রীলোকও পাঁচ প্রকার বর্ণিত হইয়াছে এবং পঞ্চজাতীয় পুরুষের অনুরূপ তাহাদের দৈর্ঘ্য পুরুষের স্কন্ধ পর্যন্ত হইবে। চুলের বর্ণনায় চিত্রসূত্রে লিখিত আছে যে তিন প্রকার চুল, দক্ষিণাবর্ত, সিংহ-কেশ (curling) ও জুটকেশ। তেমনই চক্ষুও চাঁপাকার, মৎস্যোদর, উৎপল-পত্রাহ, পদ্মপত্রনিভ ও সারাকৃতি এই পাঁচ প্রকার বর্ণিত হইয়াছে। এই একপ্রকার চক্ষু আবার মনের অবস্থাবিশেষে অন্যপ্রকার আকৃতি ধারণ করিতে পারে।—'মৎস্যোদরাকৃতিঃ কার্যো নারীনাং কামিনাম্ তথা। নেত্রমুৎপলপত্রাং নির্বিকারস্য শস্যতে।। ত্রস্তস্য রুদতশ্চৈব পদ্মপত্রনিভং ভবেৎ। ক্রুদ্ধস্য বেদনার্তস্য নেত্রং সারাকৃতি ভবেৎ।।' ইত্যাদি। বিভিন্ন জাতীয় নেত্রের মধ্যে কী জাতীয় নেত্র-তারকা আঁকিতে হইবে তাহারও বর্ণনা আছে। এই প্রসঙ্গে দেবতাদির প্রতিমা আঁকিবার সময় তাঁহাদের দৈবতসূচক কী কী বিশিষ্টতা থাকা উচিত তাহারও বর্ণনা আছে।

চিত্রসূত্রে নয় রকম স্থান বা posture-এর উল্লেখ আছে, যথা, ঋজ্বায়ত, অনৃজ্জ, সাচীকৃত শরীর, অর্ধবিরোচন এবং তাহাদের বিশিষ্ট বর্ণনা আছে। প্রত্যেক স্থান অনুসারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির প্রমাণ ও অবস্থানের বিভিন্ন প্রকারের হ্রাস ও বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। একথা Leonardo da Vinci-ও উল্লেখ করিয়াছেন : 'It is very necessary that painters should have a knowledge of the bones which support the flesh by which they are covered, but particularly of joints which increase and diminish the length of them in their appearance. As in the arm which does not measure the same when bent as when extended; its difference between the greatest extension and bending, is about one eighth of its length. ... The wrist or joint between the hand and the arm lessens on closing the hand and grows larger when it opens. The contrary happens in the arm's space between the elbow and the hand and all sides. ... When a figure is to

appear nimble and delicate its muscles must never be too much marked nor are any of them to be much swelled. Because such figures are expressive of activity and swiftness and never loaded with much flesh upon the bones.' (P. 14-18). ইহার পরে অনেকগুলি posture-এর চিত্র দিয়া Leonardo da Vinci তাঁহার বক্তব্য বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমদের চিত্রসূত্রের পরিভাষায় এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কমানো বাড়ানোর নাম ক্ষয় বৃদ্ধি। এই স্থান অঙ্কনের প্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের ছায়া বা shade দেওয়ারও উল্লেখ আছে: 'কিঞ্চিচ্ছায়াগতৌ কার্যাবুপরিষ্টাদধঃ পুরঃ'। স্থান অনুসারে পূর্বে যে ক্ষয়বৃদ্ধির কথা বলা হইয়াছে তাহা দ্বাদশ প্রকারের বলিয়া বর্ণিত আছে। ইহা ছাড়া ১২ রকমের চলনভঙ্গির কথা উল্লেখ আছে। এই চলনভঙ্গির বর্ণনাপ্রসঙ্গে চিত্রসূত্রে লিখিত আছে যে শরীরাবয়বের ক্ষয়বৃদ্ধি সম্পর্কে বুদ্ধিমান চিত্রী নিজের বুদ্ধির দ্বারায় চিত্রের ভারবাহী বা চলন্ত পুরুষের অবয়বের ক্ষয়বৃদ্ধি যোগ বিধান করিবেন। আমদের দেশের চিত্রীরা শ্বেত, কৃষ্ণ, নীল, পীত ইত্যাদিকে মূল রং বলিয়া বিবেচনা করিতেন, ইহারই সংমিশ্রণে শত সহস্র রং প্রস্তুত করা যাইতে পারে ইহা তাঁহারা বলিয়া গিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে চারি প্রকারের চিত্রের কথা তাঁহারা বলিয়াছেন—সত্য, বৈণিক, নাগর এবং মিশ্র। যথাবৎ প্রকৃতির অনুকরণ করিয়া যে চিত্র আঁকা হইত তাহাকে সত্য বলা হইত : 'যৎকিঞ্চিৎ লোকসাদৃশ্যং চিত্রং তৎ সত্যমুচ্যতে।' প্রমাণানুযায়ী অথচ দীর্ঘাকৃতি চিত্রকে বৈণিক চিত্র বলা হইত। বর্তুলাকারের চিত্রকে নাগর চিত্র বলা হইত ও ইহাদের অন্তবর্তী মিশ্রলক্ষণসম্পন্ন চিত্রকে মিশ্র চিত্র বলা হইত। চিত্রসূত্রে আরও লিখিত আছে যে কোনও চিত্রের প্রশংসা করিতে গেলে প্রাচীন আচার্যেরা রেখাপদ্ধতিরই প্রশংসা করিতেন, পণ্ডিতেরা চিত্রের জীবন বা expression-কে প্রশংসা করিতেন, স্ত্রীলোকেরা চিত্রের অলংকৃতির প্রশংসা করিতেন এবং সাধারণ লোকেরা বর্ণের প্রচুরতা দিয়া চিত্রসম্বন্ধে মত প্রকাশ করিত। এই বর্তন বা জীবন অনেক সময় পত্রাকৃতি রেখার দ্বারা প্রকাশ করা হইত, অনেক সময় বা কতকগুলি বিন্দুর দ্বারা প্রকাশ করা হইত। বর্তন বা জীবন সম্বন্ধে চিত্রসূত্রে লিখিত আছে : 'ত্রিশ্চ বর্তনাঃ প্রোক্তাঃ পত্রাহৈবিক-বিন্দুজাঃ'। চিত্রের প্রশংসা করিতে গিয়া আরও লিখিত আছে যে স্থান (posture), প্রমাণ (proportion), চিত্রভূমি হইতে চিত্রের প্রতীয়মান বর্তুলতা মাধুর্য বা grace ও প্রতি অবয়বে পরস্পর বিভক্ততা (differentiation), মূল বস্তুর সহিত সাদৃশ্য এবং স্থান (posture) অনুসারে অবয়বের হ্রস্বদীর্ঘতা, এইগুলিই চিত্রের প্রধান গুণ। এই প্রসঙ্গে নানাদেশীয় নানাজাতীয় লোক কী করিয়া অঙ্কিত করিতে হয় ও তরুশৈল, নদী, কান্তার, রাজপথ, নগর ও বিভিন্ন প্রাণী কী করিয়া আঁকিতে হয় তাহাও বর্ণিত আছে। সেই সঙ্গে ইহাও উল্লিখিত আছে যে কেবলমাত্র চিত্রশাস্ত্রানুযায়ী ছবি আঁকিলে চলিবে না, চিত্রী তাঁহার অভিজ্ঞতাদ্বারা সমস্ত জিনিস নিজে দেখিয়া সেই অনুসারে ছবি আঁকিবেন। নাট্যশাস্ত্রে যে সব রসের কথা উল্লেখ আছে তাহাদের চিত্রের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তোলা চিত্রীর একটি প্রধান লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। যে সমস্ত চিত্রে অবয়বসংস্থান বা posture সুন্দর

করিয়া দেখানো হয় না বা রসাভিব্যঞ্জন হয় না, কিংবা দৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রাণ প্রকাশ পায় না সেই সমস্ত চিত্র কুৎসিত বলিয়া পরিগণিত হয়। আর যে সমস্ত চিত্র দেখিলে মনে হয় যেন চিত্রের মানুষটি চিত্রফলক হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে, লাবণ্যের বিলাসে হাসিয়া উঠিতেছে কিংবা ভীত হইতেছে, নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতেছে তাহাই উত্তম চিত্র : 'লসতীব চ ভূলম্বো বিভ্যতীব তথা নৃপঃ। হসতীব চ মাধুর্যং সজীব ইব দৃশ্যতে॥ সশ্বাস ইব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্।'...

চিত্রশাস্ত্র নৃত্যশাস্ত্রের একটি অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইত, এই জন্য চিত্রসূত্রে লিখিত আছে যে চিত্রশাস্ত্রে যাহা অনুক্ত হইল তাহা নৃত্যশাস্ত্র হইতে বুঝিতে হইবে। নৃত্যশাস্ত্রে দেখা যায় যে বহুপ্রকারের করণ এবং অঙ্গহারাদির নির্দেশ আছে। অঙ্গহার বলিতে বুঝা যায়: 'অঙ্গানাং দেশান্তরে সমুচিতে প্রাপণ-প্রকারোঽঙ্গহারঃ'—যে যে উপায়ে শরীরের অবয়বকে বা সমগ্র শরীরকে যথোপযুক্তস্থানে চালিত করিতে পারা যায়। এই অঙ্গহার বিষয়ে হস্তপদাদির যে বিশেষ বিশেষ অবস্থান — যাহা না হইলে অঙ্গহার সম্ভব হয় না, তাহাকে করণ বলে। এই দুইটির দ্বারা নৃত্য সম্ভব হয় না বলিয়া এই দুইটিকে নৃত্য-মাতৃকা বলে। এক একটি অঙ্গহার নিষ্পন্ন করিতে অনেকগুলি করণের প্রয়োজন হয়। অঙ্গহারগুলির পরস্পর বিন্যাসবৈচিত্র্যের চাঞ্চল্যে নৃত্যের সৃষ্টি হয়। নাট্যশাস্ত্রে ১০৮টি করণেরও ৩২ প্রকার অঙ্গহারের উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া চারি প্রকার রেচকের উল্লেখ আছে,—যথা পাদরেচক, কটিরেচক, কররেচক ও কণ্ঠরেচক। বলয়াদি বিভিন্নপ্রকারে পরিভ্রমণের নাম রেচক। যদিও অনেকস্থলে নৃত্য কেবলমাত্র শোভার জন্য করা হইত তথাপি অনেক প্রকারের নৃত্য মনোভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হইত। অনেক সময় কোনও গানের সহিত নৃত্য হইলে সেই গানের অর্থটি নৃত্যের দ্বারা প্রকাশ করা হইত। এই জাতীয় নৃত্যকে নৃত্যকাব্য বলা হইত। ছলিক, ডম্বিক, ভানক প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় নৃত্যকাব্যের প্রচলন ছিল। মালবিকাগ্নিমিত্রে এই ছলিক নৃত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপে নানাপ্রকার জীবের বা বৃক্ষলতাদির বা নানা আখ্যান বিনাভাষায় নানাজাতীয় নৃত্যের দ্বারা দেখানো হইত। অনেক সময় নৃত্যের দ্বারা ঋতু বর্ণনাও করা হইত, অনেক সময় সমস্ত রামায়ণটি নৃত্যের দ্বারা দেখানো হইত, কোনও সময় বা বৃন্দাবনলীলাও দেখানো হইত। এই সমস্ত নৃত্যের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল চলন্ত এবং জীবন্ত মনোভাবকে স্পষ্ট করিয়া দেখানো। চিত্রশাস্ত্রকে নৃত্যশাস্ত্রের অঙ্গীভূত বলিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া এবং চিত্রশাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারেও আমাদিগকে এই কথা বলিতে বাধ্য হইতে হয় যে আমাদের চিত্রশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জীবনধর্মকে প্রস্ফুট করিয়া দেখানো।

ভারতীয় অঙ্কনপদ্ধতির প্রধান লক্ষ্যই ছিল জীবনকে ফুটাইয়া তোলা। এইজন্য আমাদের দেশের মূর্তিগুলির মধ্যে যে অবয়ব সামঞ্জস্যের প্রযত্ন দেখা যাইত তাহাতে অবয়বের অঙ্গীভূত যে আকাশের (space) কল্পনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা যেন পরস্পরের গতির ছন্দে লীলায়িত হইয়া মিলিত হইয়াছে। অনেকগুলি স্থান, অঙ্গহার ও করণ লইয়া একটি নৃত্য, এই গতিশীল নৃত্যের মধ্য হইতে হঠাৎ যদি একটি বিশিষ্ট স্থানকে (posture)

ছিন্ন করিয়া লওয়া যায় এবং তাহাকে যদি মূর্তি দেওয়া যায় তবেই যেন ভারতীয় চিত্রের এই রীতিটি প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহার অর্থ ইহা নহে যে ভারতীয় সমস্ত চিত্র বা মূর্তিই গতিশীল। ইহার অর্থ এই যে প্রধানত অধিকাংশ ভারতীয় মূর্তি ও চিত্রের মধ্যে যে স্থিতিটি দেখানো হইয়াছে, গতির মধ্য হইতে যেন তাহা ছাঁকিয়া পৃথক করা হইয়াছে এবং সেইজন্য নৃত্যগতির মধ্যে শরীরের যে লীলায়িত ভাব থাকে সেই ভাবটিকেই চিত্রে ও ভাস্কর্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। লীলায়িত ভাব দেখাইতে গেলে পেশি, কণ্ডরা ও স্নায়ু, অস্থি প্রভৃতিকে প্রাধান্য দিয়া দেখানো চলে না। গতি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া Leonardo da Vinci বলিতেছেন : 'These memebrs are to be suited to the body in graceful motions expressive of the meaning which the figure is intended to convey. If it had to give the idea of genteel and agreeable carriage the members must be slender and well-turned but not lean, muscles very slightly marked, indicating in a soft manner such as must necessarily appear; the arms, particularly pliant, and no member in a striaght line with any other adjoining member. ... In regard to the positions of the head and the arms they are infinite, and for that reason I shall not enter any detailed rules concerning them. Suffice it to say that they are to be easy and free, graceful and varied in their bendings, so that they may not appear stiff-like pieces of wood'. (pp.43-44) মনের গতিতে বা মননশক্তির আন্তর উত্তেজনায় যে একটি অদৃশ্য শরীরের গতির সৃষ্টি হয় তাহার বিষয় উল্লেখ করিতে গিয়া বলিতেছেন: 'A mere thought or operation of the mind excites only simple and easy motions of the body; not this way, and that way, because its object is in the mind, it does not affect the senses when it is collected within itself.' (P.48). তিনি আরও বলিতেছেন : 'There are some emotions in the mind which are not expressed by any particular motion of the body while in others the expressions cannot be shown without it. In the first, the arms fall down, the hands and all other parts, which in general are the most active, remain at rest. But such emotions of the soul as produce bodily actions, must put the members into such motions as are appropriated to the intention of the mind. This, however, is an ample subject and we have a great deal to say upon it. There is a third kind of motion which participates of the two already described'. Leonardo-র উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যাইবে যে গতি কেবল শারীর নহে—তাহা মানসও বটে। আমাদের নানাবিধ ধ্যানমূর্তির মধ্যে বিশেষত ধ্যানী বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের মধ্যে বোধিসত্ত্বদের জগদুদ্ধারের জন্য নানাভাবে অবতরণের মধ্যে এই মানসগতির প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের মূর্তি ও ছবির অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি গতিমান আকাশে পরস্পর সম্মেলনের ফলে উৎপন্ন হইত বলিয়া আমাদের দেশের অবয়ব সম্পাদনের রীতি ইয়োরোপীয় ও চিনাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। গ্রিকেরা অবয়বাকাশকে গোলককল্প স্থৌল্যের (polygonal planes) মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন।

চিনারা ডিম্বাকৃতি আকাশের (elliptical planes) মধ্য দিয়া স্থৌল্যকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। ভারতীয়েরা ধ্যানধৃত অন্তরাকাশের সঞ্চারি স্থৌল্যের (dynamic psychological volume) মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন। এইজন্য গ্রিকশিল্পের চক্ষুতে যাঁহারা চিত্ত অনুরঞ্জিত করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ভারতীয় শিল্প বোঝা এত কঠিন যে অতি দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইয়োরোপীয়েরা ভারতীয় শিল্পের মাধুর্য বুঝিতেন না। অতি অল্পদিন হইল এই সম্বন্ধে অল্প কয়েকজন ইয়োরোপীয় বিদগ্ধ ব্যক্তি সচেতন হইয়া উঠিতেছেন। আমরা চক্ষুতে যখন রূপ দেখি তখন সেই রূপের সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ পায় একটি বিশিষ্ট জাতীয় আকাশ, যাহার সহিত জড়িত হইয়া সেই রূপ আত্মপরিচয় দেয়। রেখার দ্বারা, আলোছায়ার বিন্যাসের দ্বারা ও রং-এর দ্বারা এই আকাশের বিভিন্ন ভাগের সহিত অবয়বসন্নিবেশের ও সন্নিহিত তজ্জাতীয় অন্য আকার অবয়বের সহিতও আমাদের পরিচয় ঘটে। আমার মনে হয় যে কেবলমাত্র দৃশ্যশিল্পের বেলায় নহে, শ্রব্যশিল্পের বেলায়ও এইরকম একটি আকাশ-পরিচয় ঘটিয়া থাকে। কোনও একটি গান শুনিলে বা কোনও একটি কাব্য পড়িলে মনের মধ্যে ভাব ও অর্থ মিলিয়া যেন কিছু একটা মূর্তি গড়িয়া উঠে। এই মূর্তির সঙ্গে দৃশ্যমূর্তির সাদৃশ্য আছে, দৃশ্যমূর্তি রং লইয়া, রেখা লইয়া, আলোছায়া লইয়া আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়ের বৃত্তির দ্বারা বা কাব্যের অর্থবোধের দ্বারা যে মূর্তিটি গড়িয়া উঠে তাহাতে রং, রেখা, আলোছায়া প্রভৃতি না থাকিলেও তাহাও যেন চিদাকাশের মধ্যে একটি বিশিষ্টজাতীয় আকার লইয়া গড়িয়া উঠে। Charles Mauron এই কথাটি তাঁহার *The nature of beauty and art* এই বইটির মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ছবির মধ্যে বা ভাস্কর্যের মধ্যে আমরা একটি বিশিষ্ট বর্তুলাকার আকাশকে উপলব্ধি করি। সাহিত্যের মধ্যেও এই জাতীয় একটি আকাশ আমরা অনুভব করি। Mauron বলেন : 'We should, for literature, transpose the ideas of volumes from the domain of space to the domain fo spirit and conceive the literary artist as creating psychological volumes.' এই অন্তরাকাশকে বাহ্যাকাশের ন্যায় পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, কি ঊর্ধ্ব অধ প্রভৃতি পর্যায়ের মধ্য দিয়া প্রকাশ করা যায় না সত্য, কিন্তু বাহ্যাকাশের মধ্যে যেরূপ স্থূলতা, সূক্ষ্মতা, গভীরতা প্রভৃতি ধর্ম অনুভূত হয়, অন্তরাকাশে প্রকাশিত ভাবমূর্তির মধ্যেও অনেকটা তজ্জাতীয় রূপের মূর্ত আভাস পাইয়া থাকি; সেইজন্য বাহ্যাকাশের ন্যায় জ্ঞানাকাশ বা চিদাকাশ বলিয়া স্বতন্ত্র আকাশ ভারতবর্ষে স্বীকৃত হইয়াছে। রূপপ্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে রূপ ও আকাশের মিথুন সম্বন্ধ যেমন দ্যোতিত হয়, সেই আকাশাবয়বের পরস্পর সম্বন্ধ তেমনভাবে দ্যোতিত হয়। এই আকাশের পরস্পরের বিন্যাসের লীলা যখন আমাদের চিত্তের সহিত অনুগতভাবে বা পরিচিতভাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাহা হইতে অবয়ব সামঞ্জস্যের সৌন্দর্য বা Symmetry of forms ফুটিয়া উঠে। আমরা আমাদের দুই চক্ষু মেলিয়া জড়জগতে, প্রাণীজগতে, উদ্ভিজ্জগতে নিরন্তর নানাবিধ অবয়ব-সন্নিবেশ, বহিরাকাশের নানা সংস্থান দেখিতেছি। এই প্রকৃতির মধ্যে অবয়ববিন্যাসের বা রেখা-বিন্যাসের যে সামঞ্জস্য আমাদের

চিত্তের মধ্যে গ্রথিত হইয়া যাইতেছে তাহাতেই আমাদের চিত্তের মধ্যে সামঞ্জস্যের বোধ উৎপন্ন করিতেছে। একদিকে যেমন এই সামঞ্জস্য কেবলমাত্র আকাশ-সন্নিবেশের বা রেখাসন্নিবেশের, অপরদিকে তেমন যেন রূপসন্নিবেশের মধ্য দিয়াও তাহার একটি নূতন স্বতন্ত্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই রূপসন্নিবেশ বা অবয়ব-সন্নিবেশ আবার পারিপার্শ্বিক অন্য বস্তুর সহযোগে বা বিয়োগে, আলোছায়ার অসংখ্যেয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আপনাকে নূতন নূতন রূপে প্রকাশ করিতেছে। মানুষের এমন কি ইতরপ্রাণীর মধ্যে ভাবসন্নিবেশের সহিত যুক্ত হইয়া এবং শরীর ও মনের সহিত যে অসংখ্যেয় সম্বন্ধপরম্পরা রহিয়াছে তাহার সহিত যুক্ত হইয়া সামঞ্জস্যের নব নব ভূমি সৃষ্টি করিতেছে। পৃথক পৃথক ভাবে দেখিতে গেলে কেহ হয়তো রেখাসন্নিবেশের সামঞ্জস্যের দিকে বেশি দৃষ্টি দিবেন, কেহ বা অবয়বসন্নিবেশের দিকে, কেহ বা বর্ণসন্নিবেশের দিকে, কেহ বা ভাবাভিব্যঞ্জনার দিকে অধিক দৃষ্টি দিতে পারেন; কিন্তু যথার্থ সৌন্দর্য ফুটিতে গেলে ইহাদের সমগ্রকে অপেক্ষা করে। এই জন্যই সৌন্দর্য সম্বন্ধে প্রত্যেকের দৃষ্টির সীমা অনুসারে, শিক্ষার সীমা অনুসারে এবং স্বাভাবিক বোধের তীক্ষ্ণতার কম বেশি অনুসারে অনেক মতভেদ উৎপন্ন হইতে পারে। প্রাচীন গ্রিকেরা মনে করিতেন যে অবয়বসন্নিবেশের ছন্দ সামঞ্জস্য ও একতানতার উপর সৌন্দর্য নির্ভর করে। 'Among the ancients the fundamental theory of the beautiful was connected with the notion of rhythm, symmetry and harmony of parts.' কিন্তু আধুনিক যুগে ভাবাভিব্যঞ্জকতার দিকে, জীবনকে প্রকাশ করিয়া তুলিবার দিকে অধিক আগ্রহ দেখা যায় : 'Among the moderns we find that their emphasis is laid on the idea of significance, expresiveness, the utterance of all that life contains.' এই উভয়কে একত্র করিয়া যদি লক্ষণ করিতে যাওয়া যায় তবে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ চিত্র বলা যায়, যাহা সর্বসাধারণ ভাবাভিব্যঞ্জকতার আনুগত্যে বা একতানতায় পরিদৃশ্যমান ব্যক্তিগত জীবনকে ব্যক্তিগত দ্যোতনার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে পারে। আমাদের ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে যে পর্যালোচনা করা হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান ভাবে সর্বসাক্ষিক সর্বসাধারণ অন্তরস্থভাবকে মূর্তির অবয়বের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিবার দিকে অধিক আগ্রহ দেখা যায়। কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনের দিকে আমাদের দেশের শিল্পীর তেমন আগ্রহ ছিল না, যেমন আগ্রহ তাঁহাদের ছিল কেমন করিয়া কোনও ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া অন্য জাতীয় ভাবের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে। কাম, ক্রোধ, ভয়, হর্ষ, ধ্যানানন্দ, সমাধির আনন্দ, যোগানন্দ প্রভৃতি বিবিধ ভাবের যে কোনওটির মধ্য দিয়া কোনও ব্যক্তি কী করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে এইদিকেই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্বেই মৃত্যু ও ব্যক্তিত্বের সীমাকে লঙ্ঘন করাতেই মুক্তি। এমন কি যে সমস্ত হর্ষ শোক ভয়াদি লৌকিক ভাব মানুষের ব্যক্তিত্বের সহিত বা তাহার পৃথক সীমাবদ্ধ সত্তার সহিত নিরন্তর জড়িত রহিয়াছে, সেগুলিকে যদি ব্যক্তিত্ববন্ধনের বাহিরে লইয়া গিয়া

তাহাদের ব্যক্তিত্বনিরপেক্ষ সামান্য রূপের মধ্যে অনুভব করা যায়, তাহা হইলে সেই উপায়েই মুক্তি সমীপস্থ হয় একথা আমাদের দেশে কোনও কোনও বিশিষ্ট দর্শনশাস্ত্রে অতি যত্নের সহিত প্রমাণ করার চেষ্টা হইয়াছে। রসশাস্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী অভিনবগুপ্ত 'ধ্বন্যালোক'-এ বলিয়াছেন যে রসানুভবের প্রধান কারণই এই যে রসানুভবের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের আবরণ ভাঙিয়া যায় এবং ব্যক্তিত্বের আবরণ ভাঙিয়া গেলেই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে সর্বসাধারণ অনুভবরস তাহাদের অন্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, তাহার সহিত এক হইয়া যায়; যিনি রসস্রষ্টা তাঁহার হৃদয়ের সহিত সমস্ত আস্বাদয়িতার হৃদয় যুগপৎ এক হইয়া যায়, এইটিকেই বলা যায় রসের সাধারণীকরণ। শৈবদর্শনের নানাস্থানে ও নানাতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যে কোনও রসের মধ্যেই যদি কেহ আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া যায়, ব্যক্তিত্বহারা হইয়া সেই রসের সত্তার মধ্যেই আপন সত্তা বিলীন করিয়া দেয়, তবে সেই অবস্থার সহিত ব্রহ্মাবস্থার আর বড়ো পার্থক্য থাকে না। এই তত্ত্বটি art-এ প্রয়োগ করিতে গেলে দাঁড়ায় এই যে, কোনও একটি ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইলে বা শৃঙ্গারাবস্থ হইলে সে ব্যক্তির মুখচক্ষুর কি বিকৃতি হইল তাহা যথাযথ দেখিয়া হুবহু তাহা ফুটাইয়া তোলা শিল্পীর উদ্দেশ্য নহে। ক্রোধ বা শৃঙ্গারের একটি ধ্যানধৃত রূপ আছে, সেই রূপের মধ্য দিয়া এবং সেই রূপের অনুগত বাহ্যিকে আকার ইঙ্গিতের মধ্য দিয়া শিল্পী তাঁহার ক্রোধ বা রতিকে তৎসহচরিত ব্যভিচারিভাবের সহিত কল্পনা করেন ও সেই রূপের মধ্য দিয়া কোনও ব্যক্তির রৌদ্ররস বা শৃঙ্গাররসকে ফুটাইয়া তোলেন। শৃঙ্গারী, বীর, বা রুদ্র কোনও ব্যক্তির ছবি আঁকিবার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন আছে শৃঙ্গার, বীর, বা রৌদ্রকে প্রকাশ করিবার। এইজন্য আমাদের দেশে সকলপ্রকার রাগ রাগিনীর মূর্তি পরিকল্পিত হইয়াছে। এক একটি রাগ রাগিনী চিত্তের মধ্য দিয়া খেলিয়া গেলে তাহাতে চিদাকাশের যে নানা তরঙ্গ উঠে, তাহার একটি অন্তরস্বরূপ চিদাকাশীয় বর্তুলতায় (psychological volume) অনুভূত হয়, সেই অনুভবকে রং-এর ও অবয়বের ভাষায় মূর্তি আঁকিয়া চিত্রী সেই ভাবটিকে চিরন্তনরূপে প্রকাশযোগ্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কোনও একটি ব্যক্তির মনোভাবকে যথাস্থিত অবস্থায় আঁকিতে গেলে মডেলের প্রয়োজন হয়,—দেখা আবশ্যক হয় কী ভাবের সঙ্গে মুখশরীরাদির কীরূপ ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠে। সেখানে চিত্রীর কাজ হয় দৃষ্টরূপকে রং-এর মধ্যে বা পাথরের মধ্যে ধরিয়া রাখা। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির ভাবাভিব্যঞ্জনার মধ্যে বৈষম্য রহিয়াছে, কতকগুলি ইঙ্গিত বা আকার সকলের মধ্যেই দেখা যায়, কতকগুলি বা কোনও এক ব্যক্তির শরীর গঠনের উপর বা তাহার ভাব ও শরীর গঠনের সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। ভারতীয় শিল্পী চেষ্টা করেন যে কেমন করিয়া শিল্পের ভাষার মধ্য দিয়া কোনও ধ্যানধৃত ভাবকে কোনও ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ করিবেন। এরূপস্থানে তাঁহার অনুকৃতিকে ধ্যানধৃত রূপের সহিতই অধিক সাদৃশ্য থাকিবে এবং ব্যক্তিবিশেষের ভাবাঙ্কিত আকার ইঙ্গিতের সহিত সাদৃশ্য যে কম থাকিবে ইহা বিচিত্র নহে। কোনও বোধিসত্ত্ব কেহ দেখে নাই, অথচ বোধিসত্ত্বের নানা গুণের কথা ও সেই সমস্ত গুণের সামঞ্জস্যে আন্তর চিত্রটি শিল্পীর হৃদয়ে রহিয়াছে। শিল্পীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এইদিকে যে

তিনি কেমন করিয়া তাঁহার সেই আন্তর রূপটির সহিত জনসাধারণের পরিচয় করাইয়া দিবেন—আধ্যাত্মিক রূপকে কেমন করিয়া বর্ণ ও প্রস্তরের মধ্য দিয়া এমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিবেন, যাহাতে যাহাদের চিত্তে বোধিসত্ত্বের আধ্যাত্মিক রূপ স্ফূর্তি পাইয়াছে তাহারা তাহার বাহ্যরূপ দেখিয়া চিনিতে পারিবে এবং আন্তর ও বাহ্যের পরিচয়ের আনন্দে বিভোর হইবে। মনোজগৎকে চিত্তের আদর্শকে জড়ের মধ্য দিয়া প্রকাশ করাই চিত্রীর লক্ষ্য। চিত্রশাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে চিত্র আঁকিবার পূর্বে চিত্রী স্নান করিয়া, ধৌতবাস পরিধান করিয়া, ধ্যান ও পূজার দ্বারা চিত্তকে সংস্কৃত করিয়া শুচি ও পবিত্র হইয়া চিত্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হইবেন। আমাদের দর্শনশাস্ত্রের একটি মোটা কথা এই যে আমাদের চিত্তের বা বুদ্ধির আলোড়ন কেবলমাত্র দৈহিক গতিরই কারণ নহে, পরন্তু তাহাই পঞ্চ প্রাণবৃত্তির—আমাদের জীবনীশক্তির প্রবাহের কারণ। পাশ্চাত্যচিত্রবিৎ Leonardo এইটুকু ধরিতে পারিয়াছিলেন যে মনের গতির সঙ্গে সঙ্গে দেহাবয়বের সূক্ষ্ম গতি চলিতে থাকে, কিন্তু মনের গতি যে প্রাণশক্তির কারণ এবং মনের মধ্যেই যে সমস্ত প্রাণপ্রবাহ রহিয়াছে এই সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বের মধ্যে ইয়োরোপীয় চিত্রীরা স্পষ্টত প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ভারতীয় শিল্পীর চক্ষুতে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ তিনের মধ্যেই এক প্রাণলীলা চলিয়াছে ও তিনের মধ্যেই এক চৈতন্যলীলা অবস্থাভেদে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। কোনও সময় বা তাহা লুপ্ত, কোথাও অর্ধলুপ্ত, কোথাও জাগ্রত। গাছে গাছে, লতায় লতায়, প্রাণীতে প্রাণীতে, মনুষ্যে প্রাণীতে অবয়বসন্ধানের বৈচিত্র্যপ্রযুক্ত, ও অবয়বস্বরূপের বৈচিত্র্যপ্রযুক্ত প্রাণলীলা প্রবাহের নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। কিন্তু একই প্রাণলীলার নর্তন সমগ্র প্রাণজগতে নানা তাণ্ডবে ও লাস্যে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। কোনও চিত্রী অবয়বের স্বরূপ বা সন্নিবেশকে উপেক্ষা করিতে পারিতেন না, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে কাহারও অবয়ববিশেষকে এমন অধিকতর স্ফুট করিবার তাঁর অধিকার নাই যাহাতে সমগ্র প্রাণজগতের সহিত তাহার যে চিরন্তন যোগ ও সাদৃশ্য তাহা ব্যাহত হইতে পারে। ইংরাজিতে বলিতে গেলে আমি বলিব যে, The indian artist has no right to over-emphasise the structural element of a figure so as to envisage the relation of continuity of life that it holds with the rest of the living world. সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যেও বিশেষত কালিদাসের গ্রন্থগুলিতে এই আদর্শটি বিশেষভাবে ধরা পড়ে। যখনই কোনও নারীর রূপ বর্ণিত হইয়াছে তখনই দেখা যায় যে কবি তাহার অবয়বের উপমা খুঁজিতে সর্বদাই প্রাণজগতে, উদ্ভিজ্জগতে ছুটিয়াছেন। চক্ষু কীরূপ? হরিণীর ন্যায়, শফরীর ন্যায়, চকোরীর ন্যায়, চক্রধারীর ন্যায়, নীলোৎপলের ন্যায়, পদ্মপত্রের ন্যায়।—কেশ কীরূপ? চমরীপুচ্ছের ন্যায়, ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়। হাত কিরকম? লীলায়িত লতার ন্যায়, মৃণালের ন্যায়। গ্রীবা কীরূপ? মরালের ন্যায়। উরু কীরূপ? কদলীর ন্যায়, করিশুণ্ডের ন্যায়। কাজেই দেখা যাইতেছে যে চিত্রী মানুষের অবয়বের সঙ্গে উদ্ভিদ ও 'প্রাণীজগতের সঙ্গে' একপ্রাণতার যোগে সাদৃশ্য খুঁজিয়া বেড়াইত। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এই জাতীয় উপমা অত্যন্ত বিরল। ইয়োরোপীয় সাহিত্যে যে সমস্ত উপমা দেখা যায় তাহা সমগ্রমূলক।—একটি উপমা লওয়া যাউক :

'A violet by a mossy stone
Half-hidden from the eye!
Fair as a star, when only one
Is shining in the sky.'

তাহার রূপ কিরকম? শৈবালাচ্ছন্ন ভায়লেট পুঞ্জের ন্যায়, এবং আকাশে যখন কেবল একটি মাত্র তারা প্রকাশ পায় সেই তারাটির মতো। এই উপমার তাৎপর্য এইখানে যে শৈবালাচ্ছন্ন ভায়লেট যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে, উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারা যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করে তেমনি তাহার রূপ তাহার নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ভারতীয় কবি হইলে বলিতেন, শৈবালদল বেষ্টিত হইয়াও পুষ্প যেমন তাহার লাবণ্যকে অধিকতর প্রকাশ করে, তেমনি তাহার রূপ জীর্ণবাসের মধ্য দিয়া দেদীপ্যমান হইয়াছিল। উপমা দিতে গেলেই যথাযোগ্য অবয়ব অবয়বে উপমা দিয়া ভারতীয়েরা সমগ্রের উপমা ঘটান, কিন্তু অবয়ব বর্জন করিয়া কেবলমাত্র একটি সমগ্র সংঘটনের সহিত আর একটির উপমা দিতে তাঁহারা অভ্যস্ত নন। কালিদাসের 'ঋতুসংহার' বা 'মেঘদূত' পড়িলে দেখা যায় যে মানুষের মধ্যেও যেমন জীবনলীলা চলিয়াছে সমগ্র প্রকৃতির মধ্যেও তেমনি জীবনলীলা চলিয়াছে। একস্থানে যেমন হর্ষ শোক আবেগ ভয়, অন্যস্থানেও সেইরূপই। এইজন্যই ভারতীয় শিল্পেও দেখা যায় যে একদিকে যেমন মানুষের অবয়ব সংঘটনের মধ্যে ও অবয়ব সন্নিবেশের মধ্যে সর্বসাধারণ প্রাণলীলা দেখাইতে গেলে অবয়বের অতিস্ফুটতা করা সম্ভব নয়, অপরদিকে তেমনি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে পশুপক্ষী বৃক্ষাদির সন্নিবেশ একরূপ অপরিহার্য বলিয়া পরিগণিত হইত—শুধু তাহাই নহে প্রকৃত চিত্রের সহিত প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতির একটি একতানযোগ রাখিবার জন্য সর্বদাই প্রযত্ন চলিত। কোণারকের বিশাল প্রস্তরমন্দিরটি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন যে সেখানে সূর্যাশ্বগুলির এমনই গতিভঙ্গি দেখানো হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে শত শত হস্তীর এমন শোভাযাত্রা চলিয়াছে, বলাকামিথুনেরা এমনই করিয়া ডানা মেলিয়া উড়িয়া চলিয়াছে, ফুলের মালাগুলি এমনই করিয়া লতাইয়া চলিয়াছে যে কিছুক্ষণ নিস্পন্দ হইয়া তাকাইয়া দেখিলে মনে হয় যেন যথার্থই ব্যোমপথে সূর্যাশ্ববাহিত বিরাট রথ উড়িয়া চলিয়াছে। প্রাকৃতিক জগতের বেষ্টনীর মধ্যে মানুষের বাস, সেই জগতের জীবন হইতে মানুষের জীবন, সেই জগতের রূপবোধ হইতে মানুষের রূপবোধ; বহির্জগৎ যে নিয়মে চলিতেছে, যে ক্রমশৃঙ্খলায় সেখানে জীবন প্রবাহে ছুটিয়াছে, মানুষের জীবনও সেই নিয়মে চলিয়াছে ও সেই ক্রমশৃঙ্খলায় গড়িয়া চলিয়াছে। মানুষে যাহা, জগতে তাহা, জগতে যাহা মানুষে তাহা—'লোকসম্মিতোঽয়ং পুরুষঃ, যাবন্তো লোকে, তাবন্তঃ পুরুষে, যাবন্তঃ পুরুষে তাবন্তো লোকে' (চরক)। আমাদের দেবতা নরপতি নহেন, পশুপতি। তাঁহাদের বাহন উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতে, তাঁহারা অভয় দেন মানুষকে নয় সর্বসত্ত্বকে। সর্বসত্ত্বের দুঃখমোচনের জন্য আমাদের বোধিসত্ত্ব তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এইজন্য আমাদের চিত্র কেবল মানুষকে লইয়া নয়, আমাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য মানুষের ভোগ্যের

একটি Landscape painting নয়, মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ-জগৎ লইয়া যে বিরাট প্রাণজগৎ তাহার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যে ও একতানতায় আমাদের শিল্পীর চক্ষুতে মনুষ্যালোক উদ্ভাসিত হইয়াছে। আমাদের জন্মান্তরবাদে বলে যে, মানুষই যে কোনও প্রাণী বা উদ্ভিদ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে। বুদ্ধের পবিত্র আখ্যানগুলিতে বলে যে বুদ্ধ হস্তী রূপে মাতৃকুক্ষিতে প্রবেশ করিলেন। আমদের কোনও কোনও দেবতার উদ্ভিদপত্নী প্রসিদ্ধ আছে, সূর্যের পদ্মিনী, চন্দ্রের কুমুদিনী। প্রতি দেবতার পূজার জন্য তাহাদের প্রিয় বলিয়া বিশেষ বিশেষ পুষ্পের বা বৃক্ষের প্রসিদ্ধি আছে। বিল্বপত্র না হইলে শিবের পূজা হয় না, তুলসীমঞ্জরী না হইলে দামোদরের পূজা হয় না, অপরাজিতা, অতসী বা জবা না হইলে শক্তিপূজা চলে না। আমরা নদী পূজা করি, পাহাড় পূজা করি, বেল নিম অশ্বত্থ বট তুলসী পূজা করি, আমরা বট ও অশ্বত্থের বিবাহ দিয়া পুণ্যার্জন করি। আমরা গোমাতার চরণ বন্দনা করি। বিশেষ বিশেষ পূজার সময় ইন্দুর, গর্দভ, ময়ূর, সিংহ প্রভৃতিরাও পূজা হইতে বঞ্চিত হন না। আমরা ঘরের সাপ মারি না। অহিংসা আমাদের দেশের মূলমন্ত্র, কাজেই সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে, দর্শন ও ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিল্প যে মানুষকে ও তাহার ব্যক্তিত্বকে পৃথক করিয়া দেখিবে না, অনন্ত আকাশের তলে বিশ্বের সভামণ্ডপে সমগ্র জীবলোকের আসন সন্নিধানে তাহাদেরই সহিত একতানতায় মানুষকে আঁকিয়া তুলিতে চেষ্টা করিবে, ইহাতে আর বিস্মিত হইবার কী কারণ আছে। সর্বত্রই সাহিত্য, শিল্প সংগীত জাতীয় প্রকৃতি, জাতীয় সাধনা ও জাতীয় আদর্শকে প্রকাশ করে—এই সাধনা ও আদর্শ ইয়োরোপীয় আদর্শ হইতে এতই বিভিন্ন যে যাঁহাদের চক্ষু কেবলমাত্র ইয়োরোপীয় দৃষ্টিতে অভিষিক্ত, যাঁহারা ইয়োরোপীয়দের ভালোলাগা মন্দলাগার উপরে সুন্দর অসুন্দরের বিচার করেন, তাঁহাদের পক্ষে ভারতীয় শিল্পের যথার্থ বিচার করা সম্ভব নহে। যাঁহাদের ভারতীয় সমগ্র কৃষ্টির প্রতি, সাধনার প্রতি, ধর্মের ও দর্শনের প্রতি সহানুভূতি আছে, ভারতীয় কাব্য-দৃষ্টিতে যাঁহাদের চক্ষু অনুরঞ্জিত তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে ভারতীয় মর্মকথা ভারতীয় শিল্পীরা কতদূর পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিয়াছিলেন। আমার 'সাহিত্য-পরিচয়' গ্রন্থে আমি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে পরিচিতি বা পরিচয়বোধ বা Self-realisation-ই সৌন্দর্যবোধের জনক। ভারতবর্ষের সমগ্র মর্মের সহিত যাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তিনি কী করিয়া ভারতীয় শিল্পের মধ্য দিয়ে সেই সম্বন্ধগুলিকে আপনার মধ্যে হৃদ্‌গত করিয়া আপন অন্তরস্থ ভারতীয় মর্মবাণীর সহিত তাহার পরিচয় উপলব্ধি করিবেন!

বাহিরের জগতের অনুকৃতি অপেক্ষা অন্তরের জগতের অনন্ত ও অমৃত সম্পদ শিল্পে ফুটাইয়া তোলাই ভারতীয়দের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অতি প্রাচীনকালে মহেঞ্জোদারোর শিল্পের মধ্যে আমরা ধ্যানাবস্থ নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি যোগিমূর্তির নিদর্শন পাই। মৃগবেষ্টিত পশুপতির মূর্তি পাই, ধরিত্রীমাতার মূর্তি পাই। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতবর্ষীয়দের চিত্ত অমর্ত্য আদর্শের দিকে নিবদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। যখন অন্যদেশের লোকে জয়লিপ্সায় যশোলিপ্সায় ধনলিপ্সায় তৃষ্ণাকুল হইয়া ফিরিতেছে তখন ভারতবর্ষের চিত্ত অন্তর্লোকের অমর্ত্য সম্পদের স্পর্শে মর্তলোককে তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছে। এই প্রসঙ্গে Lawrence

Binyon তাঁহার *Spirit of Man in Asian Art* গ্রন্থে Arrian বর্ণিত একটি উপাখ্যান দিয়াছেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য : 'When Alexander invaded India, the naked ascetics, numerous then as now, excited his curiosity and he questioned them through interpreters. They told him roundly that he was a nuisance to the world with his silly conquests; he had come all his way from home only to plague himself and every one else, and all of the earth that he would really possess would be what sufficed for a grave to cover his bones. "Alexander", says Arrian, "priased what they had said but continued to act in opposition to their advice." He could not, however, get them out of his thoughts; he wanted to understand them. And when he came to Taxila he conceived a great desire that one of them should live with him, because he admired so much their singular patience and fortitude. The most venerable of the ascetics dismissed his invitation scornfully : if Alexander called himself the son of God he was equally the son of God; there was nothing he desired that was in Alexander's power to give; he had all he wanted, and when he died he would be delivered from the irksome companionship of the body, whereas Alexander and his men wandered about and got no good from their wanderings. nevertheless one of the ascetics, called Kalyana, yielded; he gave up his way of life and joined the Macedonains. Alexander made him his friend. He went as far as Persia; but gradually the alien mode of his life so distressed and encumbered his spirit that he became ill and determined to die. Alexander sought in vain to dissuade him. But at last he reluctantly gave his consent. A great pyre was built; and with a completeness of misunderstanding, characteristic of the West, Alexander thought to mitigate for his friend the pangs of leaving this beautiful world by ordering a procession of precious things and all kinds of incense to be thrown upon the pyre. There was a solemn procession, the whole army was paraded, trumpets were blown and elephants added to the clamour with their cries. But Kalyana, borne on a litter, paid no attention to these pomps intended in his honour; he gave away the rugs and bowls of silver and gold which were to have been consumed with him; he was happy again at last and softly sang songs and hymns to the gods in his own language as he climbed the pyre and lay down on it. As the flames rushed over him the Macedonians marvelled that he lay quite still and moved not at all. Alexander himself had withdrawn unable to endure a sight so painful.' (pp, 38-40). এই যে জীবনকে তুচ্ছ করিয়া ইহলোকের সমস্ত কামনাকে তুচ্ছ করিয়া অমর্ত্যের

স্পর্শে মর্তকে সম্পূর্ণরূপে তুচ্ছ করিবার ক্ষমতা ইহা ভারতবর্ষের চরিত্রে যেরূপ স্ফুট হইয়াছিল, পৃথিবীর অন্য কোনও জাতির পক্ষে তাহা ঘটে নাই।

অতি প্রাচীন যুগ হইতে ভারতবর্ষীয় চিত্রপদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে। যেমন অন্যদেশে জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিত্রপদ্ধতিরও বিকাশ দেখা যায়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। Fergusson প্রভৃতিরা যে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অশোকের পর হইতেই ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির অবনতির যুগ আরম্ভ হইয়াছে ইহা বর্তমানকালের অভিজ্ঞ সমালোচকেরা স্বীকার করেন না। সারনাথস্তম্ভে শিরোভূষণরূপে যে সিংহমূর্তিগুলি রহিয়াছে ভাস্কর্যনৈপুণ্যে তদানীন্তন কোনও দেশীয় শিল্পই তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না : 'The Sarnath Capital, on the other hand, though by no means a masterpiece, is the product of the most developed art of which the world was cognisant in the third century B.C.' (Sir John Marshall—the Monuments of Ancient India—*Cambridge History of India.* Vol. I,P. 620). বহুযুগের শিল্পসাধনা না থাকিলে এরূপ ভাস্কর্য সম্ভব নহে। সিংহগঠনের প্রণালীতে তাহাদের বীর্য, তাহাদের স্ফীতশিরা ও পেশি ও তাহাদের সজীবতা, এমন স্পষ্ট ও স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে যে প্রাকৃত সিংহের পর্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে এরূপ স্বাভাবিক মূর্তি গড়া সম্ভব নহে। কিন্তু শিল্পী সিংহমূর্তিগুলিকে কেবল স্বাভাবিক করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই, সমগ্র স্তম্ভটির সহিত তাহাদের একটি একতানতা সম্পাদন করিয়াছেন। সমগ্রের মধ্যে একটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য প্রস্ফুট হইয়াছে। কিন্তু অনেকে বলেন যে এই সিংহমূর্তি পারস্যদেশীয় শিল্পীদের সাহায্যে নির্মিত হইয়াছিল এবং সেজন্যই ইহাতে যথাস্থিতির অনুকৃতির দিকে এত দৃষ্টি ছিল। ইহার পরবর্তী কালে গ্রিসীয় চিত্রশিল্পের আদর্শ ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর প্রান্তে প্রবেশ লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। শুঙ্গদের রাজত্বকালে (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে) মধ্য ভারতবর্ষে ভারহুতের মূর্তিগুলি নির্মিত হয়। এই মূর্তিগুলিতে জাতকের গল্প ও বুদ্ধচরিতের নানা অংশ নিবদ্ধ হইয়াছে; এবং এইখান হইতে আমরা দেখিতে পাই যে শরীর সন্নিবেশের যাথাথ্যের দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি না রাখিয়া কেবলমাত্র কল্পনায় ধৃত মানসচরিত্রের দিকে অধিকতর দৃষ্টি রাখা হইয়াছে : 'At the same time the forms are played out to the verge of distortion, and the influence of mental abstraction on the parts of the artist is still manifest, in the treatment of the feet or of the hands in the attitude of prayer which irrespective of anatomical accuracy are turned sideways and presented in their broadest aspect.' (Ibid, P, 625) এই খোদিত মূর্তিগুলির অবয়বে কোণাকারে নানা সন্নিবেশবৈচিত্র্য দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বেশনগরের গরুড়স্তম্ভ এই সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। ভারহুতের খোদিত মূর্তিগুলির মধ্যে দুইটি বিভিন্ন রীতির শিল্প দেখা যায়। কোনওগুলির মধ্যে শারীর সংস্থানের দিকে দৃষ্টি আছে, কোনওগুলির মধ্যে তাহা নাই। অনেকে মনে করেন যে যেগুলিতে শারীর সংস্থানের দিকে দৃষ্টি আছে সেগুলি গ্রিসীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত তক্ষশিলার ভাস্করের দ্বারা নির্মিত। ইহার পরবর্তী প্রধান শিল্পই

বুদ্ধগয়ায় প্রাচীরে খোদিত মূর্তি। এখানেও গ্রিক শিল্পের ও পারস্য শিল্পের প্রভাব দেখা যায়। ইহার পরেই আমরা পাই খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষভাগে সাঁচির কুড্যচিত্র ও তোরণচিত্র। প্রাচীনযুগে ভারতীয় শিল্পের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নিদর্শন আর নাই। খোদিত চিত্রগুলির বিষয়বস্তু প্রধানত জাতকের উপাখ্যান, বৌদ্ধ স্বর্গ, বুদ্ধগয়ায় অশোকের অভিযান, বুদ্ধগয়ার মন্দির এবং বোধিদ্রুমও বুদ্ধের মহাভিনিষ্ক্রমণ। এই খোদিত চিত্রগুলি বহুবর্ষের পরিশ্রমে নির্মিত হইয়াছিল এবং বহু শিল্পীর শ্রমের নিদর্শন ইহাতে পাওয়া যায়; সেইজন্য শিল্পপদ্ধতি সর্বত্র একরূপ নহে। কোনও স্থানে প্রাকৃত বস্তুর যথার্থ সাদৃশ্য দেখানো হইয়াছে, কোনওস্থানে ইচ্ছাপূর্বক তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। ছদন্ত জাতকের চিত্রটিতে দেখা যায়, যে সমস্ত প্রাণী পদ্মপত্রের উপর দিয়া জলের মধ্যে দৌড়াইতেছে তাহাদের তুলনায় পদ্মপত্রগুলি অনেক বৃহত্তর, আবার হাতিগুলিকে তাহাদের বিশিষ্ট গতিভঙ্গিতে স্বভাবের অনুরূপভাবেই দেখানো হইয়াছে। যদিও একটি প্লেন (plane)-এই অঙ্কিত হইয়াছে তথাপি আলোছায়ার সন্নিবেশবৈচিত্র্যেই তাহাদের স্থৌল্য সুপ্রকটিত হইয়াছে।

এইস্থানে নানাবিধ ইঙ্গিত ও মুদ্রাদ্বারা নানা অর্থ সূচনা করিবার চেষ্টা দেখা যায়। দক্ষিণদ্বারে বুদ্ধের ভস্মাবশেষ লইয়া যে যুদ্ধের চিত্র দেখা যায় ও তজ্জাতীয় পশ্চিমদ্বারের চিত্রেও শিল্পী সমগ্র অবস্থানটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সাঁচির খোদিত মূর্তিগুলির সহিত তুলনা করিলে ভারহুতের খোদিত শিল্পের নিকৃষ্টতা সহজেই প্রতীত হয়। সাঁচির সর্বোৎকৃষ্ট খোদিত মূর্তিগুলির মধ্যে যেমন রচনাবৈচিত্র্য তেমনি আলোছায়ার সন্নিবেশে বর্তুলতার প্রতীতি হয় ও মূর্তিগুলি এমন সজীব ভাবে প্রতিভাত হয় যে ভারতীয় আদিশিল্পের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া ইহাকে স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। এদিকে মথুরাতেও খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতেই গ্রিসীয় প্রেরণায় ভাস্কর্যশিল্প প্রসারলাভ করিতেছিল। গ্রিসীয় শিল্পের প্রসারে এই প্রদেশে ভারতীয় শিল্পের প্রাচীন রীতিপদ্ধতি ও আদর্শ মৃতপ্রায় হইয়া আসিতেছিল; সেইজন্য এইযুগের মাথুরশিল্পের সহিত সাঁচিশিল্পের তুলনা করিলে মাথুরশিল্পের নিকৃষ্টতা সহজেই প্রতিভাত হয়। Sir John Marshall লিখিয়াছেন : 'Dramatic vigour and warmth of feeling which characterise the reliefs of the Sanchi gateways is now vanishing; the composition is becoming weak and mechanical, the postures formal and stilted. The cause of this sudden decadence is not difficult to discover. A little before the beginning of the Christian era Mathura had become the capital fo a satrapy either subordinate to or closely connected with the Scytho-Parthian kingdom of Taxila and as a result there was an influx there of Semi-Hellenistic art too weak in its new environment to maintain its own individuality, yet still strong enough to interrupt and enervate the older tradition of Hindusthan. It was no longer a case of Indian art being vitalised by the inspiration of the West but of its being deadened by its

embrace.' (Ibid, P. 653). যদিও গ্রিক আর্ট ভারতবর্ষের মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তথাপি গ্রিক আর্টের প্রতিভা ও আদর্শের সহিত ভারতীয় আর্টের আদর্শ ও প্রতিভার এতই বৈলক্ষণ্য ছিল যে ভারতীয় অঙ্কন পদ্ধতিতে ও ভারতীয় শিল্পীর চিত্রের মধ্যে গ্রিক আর্ট কোনও স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যাইতে পারে নাই। গ্রীষ্মকালের একটি দমকা বাতাসের ন্যায় আসিয়াই বিলীন হইয়া গিয়াছে। গ্রিক আর্ট ও ভারতীয় আর্টের তুলনা করিতে গিয়া Marshall বলিয়াছেন : 'Realistic art never took a real and lasting hold upon India for the reason that the temperaments of the two peoples were radically dissimilar. To the Greek man, man's beauty, man's intellect were everything and it was the apotheosis of this beauty and this intellect which still remain the keynote of Hellenistic art even in the orient. But these ideals awakened no response in the Indian mind. The vision of the Indian was bounded by the immortal rather than the mortal, by the infinite rather than finite. Where Greek thought was ethical, his was spiritual; where Greek was rational, his was emotional. And to these higher aspirations, these spiritual instincts, he sought at a later date, to give articluate expression by translating them in the terms of form and colour.' (Ibid, p, 649). কিন্তু গুপ্তদের পূর্বে হিন্দু আর্টের চরম অভিব্যক্তিতে অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিককে প্রাকৃত ও জড়ের ভাষায় প্রকাশ করিবার মাহাত্ম্য ফুটিয়া উঠে নাই। আদিযুগের ভাস্কর্যে ভারতীয় আর্ট যথার্থভাবে প্রাণের অভিব্যক্তিরূপে প্রকাশ পায় নাই। আর্ট এখানে অনেকটা বহিরঙ্গরূপে কেবলমাত্র সৌন্দর্যসৃষ্টির দিক দিয়া এবং ধর্মকাহিনি ফুটাইয়া তুলিবার দিক দিয়াই গৃহীত হইত। গ্রিকশিল্পের মধ্যে স্বভাবকে প্রকাশ করিবার যে বীর্য আছে তাহাকে গ্রহণ করিয়া আপন প্রণালীতে আপন আদর্শের ধর্মজীবন পদ্ধতি অঙ্কিত করিবার সৌকর্যের জন্যই গ্রিকদিকের নিকট হিন্দুরা কিয়ৎকালের জন্য কিঞ্চিৎ ঋণ স্বীকার করিয়া লইল। কিন্তু তখনও গ্রিক আদর্শের প্রতি হিন্দু শিল্পীর কোনও মমতা ছিল না। সাঁচির কুড্য চিত্রে বিশ্বম্ভর জাতকের যে ছবি দেওয়া আছে তাহাতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রেম জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বদ্বারের একটি চিত্রে সমস্ত প্রাণীলোক আসিয়া বোধিবৃক্ষের উপাসনা করিতেছে। মহিষ আসিয়াছে, সিংহ ব্যাঘ্র বকাদি আসিয়াছে, নাগেরা আসিয়াছে, গরুড় আসিয়াছে, হরিণ শ্বেতহস্তী সকলে আসিয়া বোধিবৃক্ষের নিকট বোধিলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছে। কোনওখানে বা হস্তীরা আসিয়া স্তূপপূজা করিতেছে। আবার বহু ময়ূরের নানা খেলা দেখানো হইয়াছে। এই সমস্ত চিত্রের মধ্যে যে প্রাণীসাদৃশ্য দেখানো হইয়াছে সারনাথে তার তুলনা নাই। এই সমস্ত চিত্রে সমস্ত প্রাণীজগতের প্রতি যে প্রেম ও স্নেহের দৃষ্টান্ত পাই, কোনও এশিরীয় বা গ্রিক খোদিত চিত্রে তাহার তুলনা নাই। René Grousset *The Civilization of the East* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন : 'As he stands before these scenes with a delicate and tender feeling for nature, Assyrian bas-reliefs seem very conventional and even Greek bas-reliefs almost strike us as cold. In this connection we may note

what it is that distinguishes the Indian animal sculptures from those of classical arts; it is precisely this brotherly sympathy with all living beings, a sentiment having its sources at once in the dogma of transmigration and in the tenderness towards the whole universe which is distinctively a Buddhist and Jain, or in later days Krishnaite. Filled with the spirit of the Jatakas, the jungle became an earthly paradise. (P. 102). এই সমস্ত বৌদ্ধ চিত্রের মধ্যে কেবল মাত্র যে বুদ্ধচর্য্যা দেখানো হইয়াছে তাহা নহে। স্থানে স্থানে যে সমস্ত পীনোন্নত পয়োধরা দুঃখিনী মূর্তি আঁকা হইয়াছে তাহা হইতে স্ত্রীশরীরের হৃদয়োন্মাদক যে ছন্দের অবতারণা করা হইয়াছে তাহা গ্রিক ভাস্কর্যেও দুর্লভ।—

'Never even in the Greece of the classic age has the innocent and spontaneous joy of life been so happily expressed. Never has the poetry of the female form been rendered with a more sensuous power than in the statues of Sanchi. (Ibid, P. 102). পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই সাঁচি শিল্পের মধ্যে প্রাচীন যুগের ভারতীয় ভাস্কর্য তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিয়াছে। ইহার সহিত তুলনা করিলে পাঞ্জাবের গ্রিকো-বৌদ্ধ ও আফগানিস্থানের ইরানো-বৌদ্ধ শিল্প অতি ম্লানপ্রভ হয়। তথাপি ভারতীয় শিল্প ওই জাতীয় রূপান্তরিত পদ্ধতিতেই খোটান, কুচ, তুরফান ও তুংহুয়াং প্রভৃতি স্থানে প্রসার লাভ করে এবং পরিশেষে চিনদেশের শিল্পকেও প্রভাবিত করে।

উত্তর ভারতের বিদেশি রাজ্যপুঞ্জের ধ্বংসের পর হইতেই গুপ্তদের প্রাদুর্ভাব। গুপ্তদের পরেই হর্ষবর্ধনের বিশাল সাম্রাজ্য, তাহার পরই পাল ও সেন বংশীয়েরা রাজত্ব করেন। দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রদের সময় হইতেই হিন্দু রাজত্ব চলিয়া আসিতেছিল। যে সময়ে গান্ধার শিল্প গ্রিক শিল্পের প্রভাবে হতবীর্য হইয়া আসিতেছিল সে সময়কার মাথুর শিল্পেও এমন অনেক নিদর্শন পাওয়া যায় যেগুলিকে এই গ্রিক প্রভাব বর্জিত বলিয়া বলা যায়। এই সমস্ত বুদ্ধমূর্তিতে বুদ্ধকে মুণ্ডিতমস্তক এবং চূড়াকারে উষ্ণীষযুক্ত ও ভ্রূমধ্যে উর্ণাবিযুক্ত ভাবে গঠিত করা হইয়াছে। দক্ষিণ স্কন্ধ বস্ত্রহীন, বিশালবক্ষ এবং অতি লঘু বস্ত্র গাত্রসংলগ্ন করিয়া দেখানো হইয়াছে। এই জাতীয় মূর্তি হইতেই ক্রমশ গুপ্তযুগের শিল্পের তরুণ কোমল পেলব সৌন্দর্য বিকশিত হইয়াছে। গুপ্তশিল্পের মধ্যে নারীমূর্তিগুলি সাঁচির নারীমূর্তির ন্যায়ই কামোদ্দীপক, কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর ভাবব্যঞ্জক ও অতি মনোজ্ঞ ভাবে শরীরসৌষ্ঠবসম্পন্ন। অমরাবতী ছিল অন্ধ্রদের রাজধানী এবং খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক হইতে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে দেশীয় নরপতিদের করায়ত্ত ছিল। অমরাবতীর শিল্পকে এইজন্য ভারহুত ও সাঁচিশিল্পের ও গুপ্তশিল্পের মধ্যবর্তী বলা হয়। এই শিল্পে কোনও বিদেশীয় প্রভাব পড়ে নাই। এই শিল্পে প্রাকৃতিক সাদৃশ্য ও সৌন্দর্য সজীবভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গান্ধার শিল্পের যাহা কিছু প্রভাব এখানে আসিয়া পড়িয়াছিল তাহা চতুর্থ শতকের পূর্বে নহে। এই অমরাবতীতে যে সমস্ত প্রাকৃত চিত্র দেখা যায় স্ত্রীসৌন্দর্যের যে অপরূপ মাধুর্য ও লাবণ্য এখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বিস্ময়কর। একটি চিত্রে একটি মত্ত হস্তী বুদ্ধকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে, তাহাতে একদিকে যেমন ভীত জনতার সন্ত্রস্ত

পলায়নপরতা অপরদিকে তেমনি মত্তহস্তীর গভীর রোষ অতি জীবন্ত ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের প্রশান্ত কোমলতা সুচারুরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। সমগ্র ভাবে অমরাবতীর চিত্রগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বুঝা যায় যে কেমন করিয়া তাহার মধ্যে ক্রমশ চিত্রের অন্তরের দিকটি, তাহার ভাবব্যঞ্জকতার দিকটি প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সাঁচির খোদিত ভাস্কর্যে দেখিতে পাই প্রাকৃতিক জীবজন্তুর সহিত গভীর সহানুভূতি এবং সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক আকারের সহিত সৌসাদৃশ্য এবং সেখানকার বর্ণনীয় বিষয় প্রধানত প্রাচীন আখ্যান। কিন্তু অমরাবতী শিল্পের বর্ণনার মধ্যে প্রাচীন আখ্যান ছাড়া শিল্পীর মনঃকল্পনাও স্থান পাইয়াছে। শিল্পী এখানে তাঁহার মনোভাবকে তাঁহার শিল্পের মধ্যে প্রকাশ করিতে শিখিয়াছেন। এই শিল্প সম্বন্ধে বলিতে গিয়া René Grousset বলিয়াছেন : 'The purely naturalistic art of Sanchi has now become spiritualised by higher influence which has raised life to a higher plane and attained an idealism of the highest order. (Ibid, P, 137). অমরাবতীতে যে ধারার শিল্প চলিতেছিল গুপ্তযুগের শিল্পে সেই ধারারই চরম পরিণতি ঘটে। অমরাবতীর শিল্প ছিল মানবতার জীবনের চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ। গুপ্তশিল্পীরা এই চাঞ্চল্যকে আধ্যাত্মিক শান্তির মধ্য দিয়া রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। গুপ্তদের রাজত্বকাল ছিল চতুর্থ শতকে। এই সময়েই বৌদ্ধযুগের দর্শনশাস্ত্রের সর্বোচ্চ প্রাদুর্ভাব। এই সময়ে ছিলেন অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙনাগ প্রভৃতি ভুবন বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিকগণ। হিন্দুদের অনেক সূত্রগ্রন্থ ইহারই কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ লিখিত হইয়াছিল। ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের প্রভাবে সমগ্রদেশে একটি নূতন জাগরণ আসিয়াছিল। গুপ্তশিল্পীরা ভারতীয় নানাদেশীয় লোকের নানাজাতীয় বেশভূষা সম্বন্ধেই পরিচিত ছিলেন এবং মানুষের দেহ সম্মন্ধেও তাঁহাদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। (*Some notes on Indian Artistic Anatomy* by Abanindranath Tagore, published by Indian Society of Oriental Art. Cal, 1913). সেই সঙ্গে ভারতবর্ষীয় নরনারীর শরীরের মধ্যে যে একটা স্বাভাবিক কোমলতা আছে সে বিষয়েও তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। শরীরাবয়বের প্রমাণ গ্রহণের জন্য তাঁহারা গ্রিকদের জ্যামিতিক পরিমাণ গ্রহণ করিতেন না। তাঁহারা জীবনকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেন পত্রাকৃতি রেখাদ্বারা। প্রকৃতির মধ্যে আমরা কোথাও জ্যামিতিক সরল রেখা দেখি না। প্রকৃতির মধ্যে আমরা দেখি জীবনের গতি হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া বঙ্কিমরেখায় চঞ্চল হইয়া প্রবাহিত হইতেছে,—সে কোথাও স্থির গতিতে সরলরেখার পথে ধাবিত হয় নাই। একটি প্রাণীশরীরকে লইলে আমরা দেখি যে তাহার চর্মের শিখা ধরিয়া নানাঠামে বঙ্কিম রেখা ছুটিয়া চলিয়াছে। এই প্রকৃতির রেখার মধ্য দিয়াই প্রকৃতির জীবন ফুটিয়া উঠিয়াছে সেইজন্য জীবনকে অভিব্যঞ্জন করিবার জন্য গুপ্তযুগের শিল্পীরা পত্রাকৃতি বঙ্কিম রেখার সঙ্কেত ও ইঙ্গিত অবলম্বন করিতেন। সেইজন্য মুখের আকৃতি তাঁহারা করিতেন বর্তুল, ললাটকে আঁকিতেন ধনুরাকৃতিক করিয়া এবং তাহারই সামঞ্জস্যে ভ্রূযুগলকেও চাপাকৃতি করিয়া তুলিতেন। অধরোষ্ঠ আঁকিতেন বিম্বফলের ন্যায়, কামিনীর দৃষ্টি আঁকিতেন হরিণলোচনের ন্যায়, গ্রীবা আঁকিতেন মরালের

ন্যায়, উরু আঁকিতেন হস্তিশুণ্ডের ন্যায়, কটী আঁকিতেন ডমরুর ন্যায়, বাহু আঁকিতেন মৃণালের ন্যায়, অঙ্গুলি আঁকিতেন চাঁপাফুলের ন্যায়। আবার পুরুষের বেলা স্কন্ধ আঁকিতেন বৃষের ন্যায়, বক্ষ আঁকিতেন নগরের কপাটের ন্যায়, দীর্ঘ হস্ত আঁকিতেন অর্গলের ন্যায়। স্ত্রীলোকের চিত্র আঁকিতে গেলে প্রায়ই তাকে ত্রিভঙ্গ আঁকিতেন। এমনি করিয়া সমগ্রদেহের নানা অবয়বকে প্রকৃতিলোকের পত্রপুষ্পফলাদির রেখাবিন্যাসের সাদৃশ্যে গুপ্তশিল্পীরা মনুষ্যজীবনের অভিব্যঞ্জনা করিতেন এবং এই উপায়েই তাঁহারা জৈব ও উদ্ভিদ প্রকৃতির সামঞ্জস্যে মানুষের রূপ দিতেন। কোনও স্ত্রীলোকের ভঙ্গি দিতে গেলে তাহার মাথাটি ডানদিকে হেলাইতেন, পীনোন্নত পয়োধরের ভার পড়িত বাঁয়ের দিকে এবং পার্শ্ববিন্যস্ত করিয়া নিতম্বের ভারকে পদযুগলের উপর সংরক্ষিত করিতেন এবং ইহার বিপরীত ঢঙে পুরুষের ভঙ্গি সম্পাদন করিতেন। সেইজন্য মানুষের সমগ্র ভঙ্গির মধ্যে ঋজুতা অপেক্ষা বঙ্কিমতা অধিক স্থান পাইত এবং সেইজন্য বঙ্কিম অবয়বের সহিত বঙ্কিম মিলনের সামঞ্জস্য সুগঠিত হইত। এই কথাটিই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে নৃত্যের মধ্যে যে বঙ্কিম গতিভঙ্গি চলিয়াছে তাহারই একটি অংশ ছিন্ন করিয়া শিল্পী পাথরে বা বর্ণে, চিত্রে তাহা প্রকাশ করেন। খ্রিস্টীয় চতুঃশতক হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্র বৎসর পর্যন্ত এই ভাস্কর্য চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি ভারতের নিজস্ব সৌন্দর্যের আদর্শ প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। মথুরা Museum-এ রক্ষিত গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তিতে ও সারনাথের Museum-এ রক্ষিত ধর্ম-চক্রমুদ্রায় আসীন বুদ্ধমূর্তিতে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। মুখ দুইখানি দেখিলেই মনে হয় যেন আত্মার দীপ্তিতে ও পবিত্রতায় তাহা পারপূর্ণ। অথচ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠব ও অবয়বসন্নিবেশের সৌষ্ঠব ও প্রমাণ এবং সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। René Grausset এই দুইটি মূর্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন : 'The limbs are true and harmonious, the faces have a tranquil suavity and it is inspired by an art so steeped in intellectualism as to be a direct expression of the soul to the purely ideal beauty of form. Perhaps we shall understand the character of these works better if we consider that they are contemporary with the luminous and fluid metaphysics of the great Indian idealists in the fifth century of an Asanga or a Vasubandhu. (Ibid, pp. 141-42)

ইতিপূর্বে প্রসঙ্গান্তরে আমরা মুদ্রার কথা বলিয়া আসিয়াছি। মুদ্রা বলিতে বুঝায় করাঙ্গুলির বিবিধপ্রকারের সন্নিবেশবৈচিত্র্য। বৌদ্ধশাস্ত্রে, তন্ত্রশাস্ত্রে ও বিবিধ আগমশাস্ত্রে নানাপ্রকারের মুদ্রার কথা উল্লিখিত আছে। শিল্পশাস্ত্রে, নাট্যশাস্ত্রে ও চিত্রশাস্ত্রেও তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই মুদ্রাদ্বারা একদিকে তন্ত্র আগম ও বৌদ্ধশাস্ত্রে নানাপ্রকার মনোভাব, নানাপ্রকার প্রার্থনা বা আশীর্বচন প্রভৃতি ইঙ্গিতে দ্যোতিত হইত। অপরদিকে নাট্যশাস্ত্র প্রভৃতিতে ইহাদ্বারা সৌন্দর্যের বিবিধ ভঙ্গি প্রকাশিত হইত। এই মুদ্রাগুলি একদিকে ছিল দেহলতা বা দেহযষ্টির প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায়, অপরদিকে ইহা যেন দেহযন্ত্রের মধ্য দিয়া হৃদয়তরুর অর্ধপ্রস্ফুটিত কোমল মঞ্জরী। একদিকে ইহা বৃদ্ধি করিত দেহের লাবণ্য অপরদিকে ইহা প্রকাশ করিত হৃদয়ের ভাব। দুই হাতের করাঙ্গুলিকে অসংখ্যপ্রকার

বিন্যাসের মধ্যে বিধৃত করা যায়। তাহার মধ্য হইতে যেগুলিতে বিশেষ বিচ্ছিত্তি প্রকাশ পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে যাহা দ্বারা হৃদয়ের ভাব ইঙ্গিতের দ্বারা প্রকাশ পায় সেইগুলির সূচনার জন্যই এই মুদ্রাগুলির উদ্ভব। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনও দেশে এই মুদ্রা-রীতির এরূপ প্রাধান্য দেখা যায় না। সে যুগের লোক কী ধার্মিক কী শিল্পজ্ঞ সকলেই মুদ্রাগুলির সম্বন্ধে বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ছিল। মুদ্রাগুলির বিশেষ বিন্যাসের সঙ্গে সেই জন্যই সমগ্র চিত্রটি তাহাদের নিকট ভাববাহুল্যে মুখর হইয়া উঠিত।

অজন্তার চিত্র-শিল্প অমরাবতীর শিল্পের কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। অজন্তার সর্বপ্রাচীন চিত্রসৃষ্টি প্রথম শতাব্দীর পূর্বে নহে। এই অজন্তার চিত্রশিল্পে ভারতীয় চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন পাওয়া যায়। অমরাবতীর চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশ উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর গুপ্তশিল্পের বিন্যাসে অজন্তার গুহাগুলিতে বহুশতাব্দীর শ্রেষ্ঠ চিত্রিগণের চিত্র একত্র পুঞ্জীভূত হইয়াছে। পরম্পরাক্রমে পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে ভারতীয় চিত্র পদ্ধতির ক্রমোন্নতির ধারা অজন্তাতে পরিলক্ষিত হয়। গান্ধার শিল্পের যে কোনও প্রভাব অজন্তাতে নাই তাহা নহে, তবে যেটুকু গান্ধার শিল্পের প্রভাব সেখানে দেখা যায় তাহার মধ্যে ইহাও দেখা যায় যে গান্ধার শিল্পকে অতিক্রম করিয়া গ্রিসীয় আদর্শকে অবনমিত করিয়া ভারতীয় শিল্পী তাহার বিশেষত্ব ক্রমশ ফুটাইয়া তুলিতেছেন। ১৭নং গুহায় বুদ্ধের জীবনচরিত যে চিত্রে পরিণত হইয়াছে তাহাতে বুদ্ধ চরিতের আখ্যানভাগের নাট্যতুল্য ভাবব্যঞ্জকতা স্পষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই জীবন্ত ছবির মধ্যে চিত্রী কোনও ধ্যানধৃত ভাব ফুটাইয়া তোলেন নাই। চিত্রস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাদের স্থান (posture) ও অঙ্গহারাদি দ্বারা (graceful movement) তাহাদের চরিত্রের বিশেষত্ব সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ১ম ও ২নং গুহাতে যে চিত্রগুলি দেখা যায় তাহাতে ইরানীয় প্রভাব প্রতীত হয়। সম্ভবত এই চিত্রগুলি খ্রিস্টীয় ৭ম শতকে দাক্ষিণাত্যে চালুক্যবংশের রাজত্বকালে চিত্রিত হয়। ইহাদের মধ্যে দুয়েকটি চিত্রে, চিনাদিগকেও দেখা যায়। বিভিন্ন জাতীয় ও বিভিন্ন দেশীয় ব্যক্তিদের যথাযথ বেশভূষার দিকে চিত্রীর বিশেষ দৃষ্টি আছে। চিত্রসূত্রে লিখিত আছে : 'বুদ্ধ্যা রূপং যথাবেশং বরণঞ্চ মনুজোত্তম। দেশে দেশে নরাঃ কার্যা যথাবৎ তৎসমুদ্ভবাঃ। দেশং নিয়োগং স্থানঞ্চ কর্মবুদ্ধ্যা চ যত্নতঃ। আসনং শয়নং যানং বেশং কার্যং নরাধিপ।' এই বচনগুলি অজন্তা শিল্পীদের চিত্রে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। অজন্তাতে যে ইতর প্রাণীর চিত্রগুলি ১০, ১৭, এবং ১৯ নং গুহাতে চিত্রিত হইয়াছে তাহাতে সাঁচির ন্যায় তাহাদের জীবন্তভাব প্রস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রাণীর চিত্রগুলির সামঞ্জস্যে যে মনুষ্যচিত্রগুলি চিত্রিত হইয়াছে তাহা দেখিলেই বুঝা যায় যে যেন একই জীবনের লীলা প্রাণীর ও মনুষ্য লোকের মধ্য দিয়া একই জাতীয় রেখাময় নির্ঝরিণী স্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। যে সমস্ত নারীচিত্র এখানে দেখা যায় তাহার মধ্য দিয়া আমাদের চিত্ত ভারতীয় কাব্যালোকের মধ্যে যেন সঞ্চরণ করিতেছে। নারীচিত্রগুলির মধ্যে তাহাদের পরস্পর এলায়িত ভাব তাহাদিগকে যেন লতা ও পুষ্পলোকের সগোত্র করিয়া তুলিয়াছে। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীতে উর্বশী যে লতাতে পরিণত হইতেছেন এবং লতা

যে পুনরায় উর্বশীতে পরিণত হইতেছে ইহার মধ্যে উদ্ভিজ্জগতের প্রাণলীলার সহিত মনুষ্য জগতের প্রাণলীলার যে গভীর সামঞ্জস্য ও একতানতা সূচিত হইয়াছে অজন্তার চিত্রগুলি দেখিলে তাহার মর্মকথা সুস্পষ্ট ভাবে চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এমন কি নরনারী মিথুনের প্রেমাবেশে যে পরস্পরের চুম্বন চিত্রিত হইয়াছে তাহাও যেন সহকার ও মাধবীলতার আলিঙ্গনের ন্যায় মনের মধ্যে এমন একটি পবিত্র ভাব আনিয়া দেয় যে তাহা যে বৌদ্ধবিহারের অনুপযুক্ত তাহা মনে হয় না। মনুষ্যলোক যেন উদ্ভিদলোকের সহিত একত্র হইয়া উদ্ভিদলোকের আবয়বিক লাবণ্য-বিলাসের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া তোলে ও মনুষ্যলোকের ক্লিষ্টতা পরিহার করিয়া সমগ্রজীবলোকের পবিত্র প্রাণধারার নির্ঝরিণী সৃষ্টি করিয়া দৃষ্টি-সম্পাতের পরিপূত স্নানে দর্শককে অভিষিক্ত করিয়া দেয়। অজন্তা দেখিলে মনে হয় যেন চতুর্থ শতকের Florence বা Umbria চিত্রশালায় আমরা দাঁড়াইয়া আছি। নারীচিত্রগুলির মধ্যে কামোদ্দীপকতা ও অভিলাষজনকতা ও নারী দেহের আকর্ষণ স্ফুট প্রতীত হইলেও তাহাদের নগ্ন দেহের সৌন্দর্য যেন পবিত্রতাকে আবহন করে; মনে হয় যেন Botticelli-র 'Birth of Venus' দেখিতেছি। একটি পেলব সম্পৃহতা এমন কোমল আবেশবিহীন ভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে, তাহাতে উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষার তাণ্ডব নৃত্য আসিয়া সেই মনোহারী তপোবন সুলভ শান্ত সৌন্দর্যকে শরাভিঘাতে বিদ্ধ করে নাই। মানুষের শারীর লাবণ্যের মধ্যে সমস্ত প্রকৃতি যে তাহার মাধুর্য ঢালিয়া দিয়াছে এবং সেই লাবণ্যের নির্ঝরিণী যে ব্রহ্মার মানস সরোবর হইতে প্রসূত হইয়াছে ও সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ও প্রাণ-প্রভাবের সমগ্র পবিত্রতায় যে তাহা অভিমন্ত্রিত ও অভিষিক্ত হইয়াছে সমস্ত অবয়বের লীলালহরের মধ্য দিয়া তাহা যেন ললিত-লীলা-লাস্যে চক্ষুর সম্মুখে স্নিগ্ধোজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই চিত্রগুলি দেখিলে বুঝা যায় যে কী পবিত্রতার আদর্শ লইয়া মহাকবি কালিদাস জগন্মাতা পার্বতীর রূপ বর্ণনা করিতে গিয়া তাহার সমগ্র দেহের সমস্ত প্রধান অবয়বের রূপ-লাবণ্য অমৃতময়ী ভাষায় চিত্রিত করিতে কোনও দ্বিধা বোধ করেন নাই। আকাঙ্ক্ষা-বর্জিত ভাবে দেহের সামঞ্জস্যে জগৎ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফলতার জন্য স্ত্রী-শরীরে যে লাবণ্য ফুটিয়া উঠে তাহা প্রভাতের অরুণোদয়ের ন্যায়, সন্ধ্যাতারার ন্যায়, ললিত-লীলায়িত কমলের ন্যায়, ভাগীরথী-নির্ঝরিণী-শীকরের ন্যায়, আত্মার চেতনাদীপ্তির ন্যায় পবিত্র আনন্দের সৃষ্টি করে। অজন্তাতে ইহা এতই সুস্পষ্ট হইয়াছে যে যাবনিক দৃষ্টিতে দেখিয়াও René Grousset এইগুলি সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন : 'The treatment of the hands alone by the painters of Ajánta would be enough to express the almost Franciscan tenderness by which they are animated. What a spiritual quality there is in their slightest gestures, what mystical feeling in the most amorous caress! Even in the idyllic scenes body and soul alike are instinct with an emotion of piety. Thus all this naturalistic art remains passionately mystical and is constantly lifted above itself by the most fervent *bhakti* (piety) as well as by the loftiest idealism.' (Ibid, P. 158) এই

চিত্রগুলির মধ্যে স্বভাবকে এমন করিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে, স্বাভাবিক মনুষ্য প্রেমকে প্রেমের পবিত্রতার দিক দিয়া এমন করিয়াই ফুটানো হইয়াছে যে স্বাভাবিক ঐন্দ্রিয়কতার মধ্য দিয়া অপ্রাকৃত ও অতীন্দ্রিয় প্রেম শিহরণের পবিত্রতাটুকু প্রভাতী শেফালিকার ন্যায় সমগ্র ধরণীতল শান্তোজ্জ্বল হাস্যে বিকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ১ম গুহাতে যে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব অঙ্কিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বলিতে গিয়া René Grousset বলিয়াছেন : 'A figure worthy of a place in the art of the world by the sight of the sublimest incarnations of the Sistin Chapel, or of such drawings as that of Christ for the 'Last Supper', in which Leonardo da Vinci has expressed the most intense emotions of the soul. To sum up these multifarious impressions in a single formula, we may say that the predominant feature of Ajanta is an intimate and harmonious fusion of the Old Indian naturalism of Sanchi with its youthful freshness and the infinite gentleness of Buddhist mysticism. And it is this which makes Ajanta a complete expression of every side of the Indian soul.' [Ibid, P. 159].

ভারতবর্ষের অধিকাংশ পুরাণই খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে একাদশ শতকের মধ্যে লিখিত হয় এবং পৌরাণিক ধর্ম ও পৌরাণিক চিত্র ও ভাস্কর্য খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক হইতেই প্রচুর ভাবে আরব্ধ হয়। ইহারও বহুপূর্ব হইতে যে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি গঠন ও প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা ছিল সেই সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করা যায় না। বেশনগরের গরুড়স্তম্ভ হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেও ভাগবত ধর্ম এমন বীর্যবান ছিল যে গ্রিকেরাও ওই ধর্ম গ্রহণ করিত। খ্রিস্টীয় দশম শতকের পর হইতে যে সমস্ত মূর্তি নির্মিত হইত তাহা প্রায় সর্বত্রই হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমা ছাড়া আর কিছুই নহে। পঞ্চম শতাব্দীর বরাহের 'বৃহৎসংহিতা'-য় বহু হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমা গঠন প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। শিল্পশাস্ত্রগুলির মধ্যে ও পঞ্চরাত্র আগমের মধ্যে বহু হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমা গঠন প্রণালী বর্ণিত আছে। জাভা শিল্পের মধ্যেও বহু হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখা যায়। হিন্দুর দর্শন শাস্ত্রের নানা গভীর তত্ত্ব ও ধ্যান ও যোগের গভীর মহিমা প্রাকৃতিক উপায়ে সর্বজনগম্য করিবার চেষ্টায় পুরাণ শাস্ত্রের উৎপত্তি। পুরাণ শাস্ত্র, নারায়ণ, লক্ষ্মী, শিব, পার্বতী, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও তৎ সহচরিত নানা দেবদেবীর আখ্যানে ও বিষ্ণুর নানা অবতারের নানা চিত্র ও মনুষ্যলোকে অবতার দশায় তাঁহার লৌকিক চরিতাবলির নানাবিধ মহত্ত্বে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত নানা আখ্যানের মধ্য দিয়া বিষ্ণু-শিব-পার্বতী ও লক্ষ্মীর নানা আবির্ভাবের মধ্য দিয়া নানাবিধ আধ্যাত্মিক ভাব কল্পিত হইয়াছে। পৌরাণিক ধর্মের মর্মকথা আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জ্ঞান সমাধিজ প্রজ্ঞা ও ভক্তি প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে; নানা আখ্যানের মধ্য দিয়া, নানা রূপকের মধ্য দিয়া সৃষ্টি ও প্রলয়ের, জন্ম ও মৃত্যুর সনাতন লীলা-কাহিনি হৃদ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দু দেবদেবীর যে সমস্ত প্রতিমা-শিল্প পাওয়া যায় সেগুলির সমালোচনা করিয়া শিল্পকলার নৈপুণ্যের দিক হইতে তাহা বিচার করিবার অবসর আমাদের বর্তমান গ্রন্থে নাই। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে সাঁচি-অমরাবতী ও অজন্তার

শিল্পীদের সগোত্রেরা তাঁহাদের পূর্বাভ্যস্ত শিল্প-বিদ্যার দ্বারা পৌরাণিক কল্পনাগুলিকে রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইলোরা ও মহাবলীপুরে এই শিল্পের অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্ম বিশেষ প্রভাব লাভ করিয়াছিল। সেইজন্য নানা জাতীয় শিবমূর্তি ও শিবাখ্যানে দক্ষিণ দেশীয় শিল্প পরিপূর্ণ। মাদ্রাজ মিউজিয়ামে রক্ষিত নটরাজ-মূর্তি পর্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে হিন্দুরা কী ভাবে জীবনের নৃত্যের মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর লীলাকে অত্যন্ত সমভাবে সমাহিত করিয়া দেখিতে শিখিয়াছিলেন। হিন্দু বলেন যে সেই মহাচিন্ময় স্বরূপের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব বিধৃত রহিয়াছে। তাহার উন্মেষ ও নিমেষে কোটি কোটি যুগের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ধ্বংস হইতেছে ও কোটি কোটি যুগের সৃষ্টি-প্রবাহ আবর্তিত হইতেছে। তরুলতা গুল্মের সহিত জীবজন্তুর সহিত সমগ্র নরনারী অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যেখানে সৃষ্টি সেখানে ধ্বংস, যেখানে ধ্বংস সেইখানেই সৃষ্টি। এই জন্যই সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যে ব্যক্তিগত হর্ষশোকের কোনওই অবসর নাই। সৃষ্টি ও ধ্বংসের মধ্যে সেই অপরূপেরই রূপময় লীলায় নটরাজের জটাভার উন্মুক্ত হইয়া নাচিয়া নাচিয়া এই চিরন্তন বিশ্বদোলার ইঙ্গিত করিতেছে। পলকে প্রলয় পলকে সৃষ্টির সূচনা করিতেছে। তাঁহার বাম পদে নটরাজ মৃত্যুর উপর নৃত্য করিতেছেন, একটি দক্ষিণ হস্তে লেলিহানজিহ্বা অগ্নিশিখা লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, আর একটি দক্ষিণ হস্তে বিশ্বকে অভয় দিতেছেন। তাঁহার মুখে হাসি, জন্ম-মৃত্যুর খেলায় আপন লীলারসকে উন্মুক্ত করিতেছেন। মৃত্যু ও অমৃত্যুর ঝরনা তাঁহার নৃত্যের মধ্য দিয়া যেন ঝরঝর ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। নৃত্যের মধ্যে তাঁহার লীলায়িত দেহের ও লীলায়িত বাহু-চতুষ্টয়ের ও পদযুগলের সামঞ্জস্য কোথায়ও ব্যাহত হয় নাই। প্রতি অঙ্গের লাবণ্য সমগ্র নৃত্যের ধারার সহিত আপন আপন ক্ষুদ্রধারা মিলাইয়া সমগ্র নৃত্যের সামঞ্জস্য-সুষমাকে উদ্ভাসিত করিতেছে। বিশ্বলীলার ছন্দে যে সমগ্র জগতের ছন্দ বাঁধা রহিয়াছে—যে গহ্বরে মৃত্যু সেই গহ্বরেই যে অমৃত্যু—যেখানে তমোলোক সেইখানেই যে জ্যোতির্লোক—যেখানে আলো সেইখানেই ছায়া—যেখানে দক্ষিণাবর্ত সেইখানেই যে বামাবর্ত, এমনি করিয়া যে একটি দোলার মধ্য দিয়া মৃত্যু ও অমৃত্যুর ভয় ও আশার, বিভীষিকা ও উৎসাহের নিরন্তর খেলা চলিয়াছে এই গভীর তত্ত্বটিকে নটরাজের মূর্তির মধ্যে শিল্পী ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মনে হয় না পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও শিল্পী ইহলোকের ও পরলোকের এই জাতীয় গূঢ় রহস্যকে জড়ধাতুর মধ্য দিয়া এমন করিয়া প্রাণ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। জড়ের মধ্যে এমন করিয়া অবিনাশী অমর আত্মার লোকাতীত অনুভবকে জড়ের ভাষায় বিধৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মনের গহন কন্দরের মধ্যে যে ভাব ধ্যানস্পন্দের মধ্যে লোকাতীত অনুভবের স্পর্শে রূপ পরিগ্রহ করে তাহাকে রেখা ও বর্তুলতার ভাষায় শিল্পের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ করিবার এই জাতীয় চেষ্টা ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য দেশে সম্ভব নহে। ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ ও হিন্দুশিল্প জাভা প্রভৃতি স্থানে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার কী অপরূপ নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে তাহা সুধী সমাজে সুপরিচিত। শুধু তাহাই নহে; তিব্বত তুর্কীস্থান তুর্ফান এমন কি চিন ও জাপান ও সিংহল প্রভৃতি স্থানের শিল্প ভারতবর্ষীয় শিল্পের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে।

ভারতীয় শিল্পপদ্ধতির সম্বন্ধে বহুকথা বলিবার ছিল। কিন্তু বর্তমান স্বল্পপরিসর গ্রন্থে তাহা বলা সম্ভব নহে। তথাপি ভারতীয় চিত্রকলার পদ্ধতির সম্বন্ধে ভারতীয়েরা কীরূপ চিন্তা করিতেন সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা না বলিয়া এই গ্রন্থ সমাপ্ত করা যায় না। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে বুদ্ধঘোষের 'ধম্মসঙ্গনী'-র অট্‌ঠশালিনী টীকায় চিত্রীর চিত্র-কল্পনা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি বলিতেছেন যে চিত্তকে এই জন্যই চিত্ত বলা হয় যেহেতু তাহা চিন্তা করে। চিত্তকে চিত্ত বলিবার আর একটি তাৎপর্য এই যে কুশলাকুশল সর্ববিধ ক্রিয়া অতি দ্রুতগতিতে ইহার মধ্যে উপস্থিত হয়। সেইজন্য চিত্তকেই সরাগ সদোষ সমোহ প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। সমস্ত চিত্তের মধ্যেই কামনা গৃধ্নুতারূপে অন্তর্ধৃত হইয়া রহিয়াছে এবং তাহারা প্রকট হইয়া উঠিলে তাহাদিগকে চিত্ত বলা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ চিত্রকরণ ব্যাপার লওয়া যাইতে পারে। চিত্রকর্ম ব্যতিরিক্ত চিত্রকরের স্বতন্ত্র চিত্ত নাই, চিত্রকর যখন চিত্র করেন তখন তাহার চিত্তে এই কল্পনা উদয় হয় যে আমি রূপ নির্মাণ করিব। এই কল্পনাবস্থ চিত্তকে চিত্ত-সঞ্‌ঞা বলা হয়। চিত্তকেই কল্পনারূপে চিত্রের ক্রিয়ারূপে বিধারণ করা হয়, ইহাকেই রেখাদ্বারা গ্রহণ করিলে ও রঞ্জন উদ্যোতন বর্তনাদি ক্রিয়া দ্বারা চিত্রপটে সুবিন্যস্ত করিলে বাহ্য চিত্তক্রিয়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু চিত্ত সদা গতিশীল, এই উৎপন্ন চিত্র তাহার চিত্তের মধ্যে আর একটি নূতন বিচিত্ররূপকে উৎপন্ন করে এবং সেই সঙ্গে তাহার চিত্তে নানাবিধ কল্পনা উপস্থিত হয়। চিত্রী মনে করে এই চিত্রের উপরে এই রকম দিলে ভালো হইত, এইখানে এইরকম দিলে ভালো হইত, উভয় পার্শ্বে এই রকম দিলে ভালো হইত, এই নূতন নূতন কল্পনা অনুসারে সে আরও নূতন নূতন চিত্র বিন্যাস করে, এবং এইরূপে সমগ্র চিত্ররূপটি বহির্বিন্যস্ত হয়। এইজন্য বহির্লোকে যাহা কিছু বিচিত্র শিল্পজাত লোকে প্রস্তুত করে তাহা সমস্তই চিত্তের ক্রিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। চিত্তের ক্রিয়ার বিচিত্রতাবশতই প্রত্যেক চিত্রের নিষ্পাদক তদনুরূপ বিভিন্ন বিভিন্ন চিত্ত উৎপন্ন হয় এবং তাহার ফলে বিভিন্ন চিত্র উৎপন্ন হয়। যদি কেহ চিত্রানুরূপ সঙ্কল্প মনের মধ্যে বিধারণ করে অথচ বহির্ব্যাপারের দ্বারা তাহাকে চিত্ররূপে ফুটাইয়া না তুলে, তথাপি চিত্রাকারে উদ্ভাসিত তাঁহার চিত্তকেই চিত্র বলিয়া মনে করিতে হইবে। বহিশ্চিত্র ও চিত্তচিত্র এই উভয়ের মধ্যে চিত্তচিত্রই শ্রেষ্ঠতর।

'কামা চেত্থ একম্ এবং চিত্তং ন হোতি
চিত্তানম্ পন অন্তোগধত্তা এতেসু যং কিঞ্চি একংপি
চিত্ততায় চিত্তম্ পি বত্তুং বট্টতি। এবং তার চিত্ততায় চিত্তং।
কথং? চিত্তকরণতায়া তি। লোকস্মিং হি চিত্তকম্মতো
উত্তরিং অঞ্‌ঞং চিত্তং নাম নত্থি। কস্মিম্ পি চরণং নাম
চিত্তং অতিচিত্তম্ এব হোতি? তং করন্তানং চিত্তকারানং
এবং বিধানি এত্থ রূপানি কাতব্বানী তি
চিত্তসঞ্‌ঞা উপ্‌পজ্জতি। চিত্তায় সঞ্‌ঞায় লেখায়
গহণরঞ্জণৌজ্জোতনবত্তনাদিনিপ্‌ফাদিকা

চিত্তকিরিয়া উপ্‌পজ্জন্তি ততো চরণসংখাতে
চিত্তে অঞ্ঞঞ্ঞতরং বিচিত্তরূপং নিপ্‌পজ্জতি ততো
ইমস্‌স রূপস্‌স উপরি ইদং হোতু হেট্‌ঠা ইদং
হোতু উভয়পস্‌সে ইদন্‌ হি চিন্তেত্বা
যথাচিন্তিতেন কমেন সেসচিত্তরূপনিপ্‌ফাদনং
হোতি। এবং যং কিঞ্চি লোকে বিচিত্তং সিপ্‌পজাতং
সব্বন্‌ তং চিত্তেন এব কয়িরতি, এবং ইমায় করণ
-বিচিত্ততায় তস্‌স তস্‌স চিত্তস্‌স নিপ্‌ফাদকং
চিত্তম্‌ পি তথা এবং চিত্তং হোতি। যথা চিন্তিতস্‌স
বা অনবসেসস্‌স অনিপ্‌পজ্জনতো ততো পি
চিত্তম্‌ এব চিত্ততরং।'

('অট্‌ঠশালিনী' পৃ. ৬৪ P.T.S. 1891)

বুদ্ধঘোষের উপরি উদ্ধৃত বাক্যে চিত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে যে মত দেখা যায় তাহা অতি বিস্ময়জনক। আধুনিককালে ইটালীয় দার্শনিক ক্রোচে এই মত প্রকাশ করিয়া অভিনবতার দাবিতে অসাধারণ যশ অর্জন করিয়াছেন। এই মতকে Expressionist theory বলিয়া বলা হয় এবং অন্যত্র ক্রোচের আলোচনা প্রসঙ্গে এই মতের আমরা প্রচুর ব্যাখ্যা করিয়াছি। কেবলমাত্র কয়েকটি পংক্তির মধ্যে ক্রোচের Aesthetic-এর মূল তত্ত্বটি ক্রোচে অপেক্ষাও সুস্পষ্ট ভাবে বুদ্ধঘোষ বর্ণনা করিয়াছেন। বুদ্ধঘোষের বক্তব্য ছিল এই যে, চিত্ত বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহাকে বিশ্লেষণ করিলে দুইটি বস্তু আমরা পাই, একটি মননব্যাপার আর একটি মননফল বা বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান, বিজ্ঞেয় বা অর্থের সহিত অভিন্ন রূপ। চিত্তব্যাপারের দ্বারা যাহা ফুটিয়া উঠে তাহাকে অন্তরের দিক দিয়া বলি জ্ঞান, বাহিরের দিক দিয়া বলি আর্ট। চিত্ত আপন গতিবশে আপনি যখন প্রবাহক্রমে চলিতে থাকে সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রবাহের যাহা ফল তাহা ও আপনার মধ্যে সঞ্চয় করিয়া লইয়া চলে। চিত্তের পূর্ব মুহূর্তের গতিতে যাহা ফলরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, দ্বিতীয় মুহূর্তের গতিতে তাহাই গতির মধ্যে বিধৃত হইয়া দ্বিতীয় আর একটি ফলকে উৎপন্ন করিতেছে। আবার তৃতীয়ক্ষণে প্রথম ও দ্বিতীয় ফল প্রবাহসন্ততিরূপে তৃতীয় ফলকে সৃষ্টি করে। এমনি করিয়া সমগ্র জীবনের চিত্তগতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ফলীভূত জ্ঞান হর্ষ সুখাদি সমস্ত চিত্তফল অনুস্যূত থাকিয়া চিত্তের গতিকে বিচিত্রতর বিশিষ্টতর করিয়া নূতন নূতন বিচিত্রতর বিশিষ্টতর ফল উৎপাদন করিয়া তাহাকে আপন প্রবাহ ধর্মী করিয়া উত্তরোত্তর নবীন নবীন ফলরূপে প্রস্পন্দিত করিয়া চলিয়াছে। চিত্তের এই নিরন্তর গতিশীলতায় নিরন্তর নূতন নূতন সৃষ্টি চলিয়াছে। চিত্তে এই গতিশীলতার বৈচিত্র্যের প্রতি বাহ্য বস্তুর নানা বিচিত্রপ্রকারের কারণতা থাকিলেও চিত্তের গতির মধ্যে গৃহীত না হইলে তাহার ফলরূপে প্রকটিত না হইলে কোনও বস্তুরই অভিব্যক্তি হইতে পারে না। এইজন্য যাহা কিছু আমরা চিত্তবাহ্য বলিয়া মনে করি তাহা স্বরূপত চিত্তপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নহে। এই কথাটি চিত্রের

উদাহরণ দিয়া বুদ্ধঘোষ বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি বলেন চিত্তের ক্রিয়াশীলতা ছাড়া চিত্র বলিয়া আর কিছুই নাই। প্রশ্ন উঠিতে পারে চিত্তের ক্রিয়া অভ্যন্তরীণ ধর্ম, চিত্র বাহ্য বস্তু, এ অবস্থায় চিত্রের চিত্তাতিরিক্ত সত্তা নাই, এ কথা কী করিয়া বলা চলে। চিত্ত গতিশীল, গতিময়, চিত্র স্থায়ী, এই উভয়কে কী করিয়া এক বলা যায়। ইহার উত্তরে বুদ্ধঘোষ বলিতেছেন, চিত্র করিবার সময় চিত্রকরদের মনে এইরূপ চিত্রসংজ্ঞা বা চিত্রকল্পনা উৎপন্ন হয় যে আমরা এইরূপ এইরূপ রূপ সৃষ্টি করিব। এই চিত্র কল্পনাকে তদনুরূপ রেখা, বর্ণানুরঞ্জন, উদ্যোতন, ও বর্তনাদি নিষ্পন্ন করিতে পারে এইরূপ চিত্তক্রিয়াও সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন হয়। এই চিত্তক্রিয়ানিষ্পন্ন চিত্তাবস্থা পুনরায় নানা সূচনা আনিয়া দেয়—এই চিত্রের উপরে এই রকম করিব, ইহার এইখানে এইরূপ করিব, ওইখানে ওইরূপ করিব, ইহার উভয় পার্শ্বে এইরূপ করিব, এই চিত্ত ব্যাপার ও চিত্তফল অভিন্ন এবং যখনই কেহ কোনও বিচিত্র শিল্প রচনা করে তখন তাহার সৃষ্টি চিত্তের দ্বারাই করিয়া থাকে। যদি বহির্জগতে চিত্তকল্পনাকে জড়ের মধ্য দিয়া প্রকাশ নাও করিত তথাপি চিত্রীর চিত্রসৃষ্টি অক্ষুণ্ণ থাকিত। কারণ বহির্জগতে যাহা ফুটানো যায় তাহা চিত্তেরই অনুকার মাত্র এবং সেই জন্যই বহিশ্চিত্র হইতে চিত্তচিত্র প্রশস্যতর। ফল কথা এই হইল যে চিত্তের সৃষ্টিও যাহা, তাহার অভিব্যক্তিও তাহা, তাহার প্রকাশও তাহাই। এবং যখনই আমাদের চিত্ত কোনও বিশিষ্টরূপে আপনাকে প্রকাশ করে তখন সেই রূপসৃষ্টির জগৎই আমাদের যথার্থ জগৎ। চিত্র আঁকিবার সময় বাহিরের রেখা রূপাদির বিন্যাস অন্তরের অনুকৃতি মাত্র। শিল্পীর যথার্থ সৃষ্টি তাহার চিত্তাভিদ্রুতির মধ্যে, তাহার কল্পনার মধ্যে। আশা করি ক্রোচের মতের সহিত এই মতের অত্যন্ত সাদৃশ্য বা ঐক্য বুঝাইবার জন্য গ্রন্থবাহুল্যের প্রয়োজন হইবে না।

বুদ্ধঘোষ যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে কয়েকটি কথা তাঁহার দ্বারা মুখ্যত অনুক্ত হইলেও ভাবতঃ উক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। সেইগুলিকে পরপর নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। প্রথমত শিল্পবোধ বা শিল্পসৃষ্টি, চিত্তেরই একটি অবস্থা—an aesthetic state of the mind কাজেই সৌন্দর্যবোধ বলিতে যে স্বভাবটি আমরা বুঝি তাহা একটি বিশিষ্ট মানসিক বৃত্তি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বহির্বস্তু সম্বন্ধে তাহার প্রয়োগ ভাক্ত বা গৌণ। দ্বিতীয়ত, শিল্পানুগত চিত্তবৃত্তির সহিত সুখবোধের কোনও অব্যভিচারী সম্বন্ধ নাই। তৃতীয়ত, রূপবোধ অর্থই রূপসৃষ্টি, শিল্পবোধ অর্থই শিল্পসৃষ্টি এবং প্রকাশ ও বোধ অভিন্ন। যেহেতু অন্তরের সৃষ্টি, প্রকাশ বা বোধকেই শিল্প বলা যায় সেইজন্য বহিঃশিল্পকে তাদৃশ চিত্তের অনুকৃতি মাত্র বলা যায়। তাহা না ঘটিলেও শিল্পের অন্তঃপ্রকাশের দ্বারাই তাহার প্রকাশ সুসম্পন্ন হইয়াছে। চতুর্থত, শিল্পসৃষ্টির মধ্যে যেহেতু চিত্তের ক্রমবাহী গতির পরিচয় পাই সেইজন্য যদিও শিল্পসৃষ্টির সময়ে সেই শিল্পের কোনও একটা অংশ কোনও একটি গতিক্ষণের ব্যাপারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে তথাপি তৎক্ষণোৎপন্ন সেই শিল্পচিত্তের প্রভাবে তৎপরবর্তী চিত্তক্ষণপরম্পরা নানাবিধ সম্বন্ধজালে অনুরঞ্জিত হইয়া পূর্বানুরূপ বা পূর্বসঙ্গত অন্য অন্য শিল্পচিত্ত উৎপন্ন করিয়া সমগ্রের সহিত সামঞ্জস্যে একটি সমগ্র শিল্পচিত্তকে উৎপন্ন করে।

আনন্দকুমার স্বামী তাঁহার *Transformation of Nature in Art* গ্রন্থে চিত্রোদ্ভাবনবিষয়ে নূতন বর্ণনা দিয়াছেন। বর্ণনাটির তাৎপর্য এই যে যোগী সাধকের ন্যায় শিল্পী সমস্ত বিরুদ্ধ ও বিক্ষেপক মনোবৃত্তি দূর করিয়া দেবতার মূর্তিকে মনোনেত্রে দর্শন করিবেন। তাঁহার মন সেই দেবতার মূর্তিকে বহুদূর হইতে আকর্ষণ করিয়া নিয়া আসে। পরিশেষে সাধনার আকর্ষণ স্বর্গলোকে পৌঁছায়, যেখানে সমস্ত শিল্প তাহার নীরূপ রূপে বিদ্যমান। সেইখান হইতে তিনি দেবীকে তাঁহার হৃদয়াকাশে আনয়ন করেন। সেই অন্তর্লোকে দ্রষ্টা ও দৃশ্য, শিল্পী ও দেবতার সংস্তব বা পরিচয় ঘটে। দেবীর জ্ঞানসত্তাস্বরূপ অন্তর্জ্ঞেয়রূপে অন্তরাকাশে প্রতিবিম্বের ন্যায়, স্বপ্নের ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। নানা অবয়বসম্পন্না ও নানা বেশভূষাবতী দেবীর সহিত শিল্পিহৃদয়ের ঐক্য সংঘটিত হয়। আপনার সহিত অভিন্নরূপে এই যে দেবীর পরিচয়লব্ধ স্বাত্ম-সাক্ষাৎকার তাহাকেই শিল্পী প্রস্তরে বা অন্য উপাদানে রূপ দিয়া থাকেন। Fouche প্রণীত *L'iconographie Buddhique de l'nde"* গ্রন্থের ১৯০৫-এ প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃ. ৭-১১) যে উদ্ধৃত সংস্কৃত উক্তি আছে, কুমারস্বামী তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং ডাক্তার বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের *Iconography* গ্রন্থের ১৬৯ পৃ. 'কিঞ্চিদ্ বিস্তর তারাসাধন' পুস্তকের যে অংশ উদ্ধৃত আছে তাহাও উহা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ওই উভয় গ্রন্থে যে ধ্যানের বর্ণনা আছে, তাহা সাধক সম্বন্ধে প্রযোজ্য। Fouche কৃত বর্ণনাটি অনুপমরক্ষিত কৃত 'শ্রীখসর্পণ-লোকেশ্বর-সাধন' গ্রন্থ হইতে গৃহীত। 'কিঞ্চিদ্‌বিস্তর তারাসাধন' গ্রন্থও অনুপম রক্ষিত কৃত। এই উভয় গ্রন্থে যে সাধন পদ্ধতি দেওয়া হইয়াছে তাহাও কুমারস্বামীর বর্ণনা হইতে কথঞ্চিৎ বিভিন্ন। অবশ্য মোটামুটি ভাবে যথেষ্ট মিল আছে কিন্তু সাধকের চিন্তা পদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা প্রযোজ্য, শিল্পকার সম্বন্ধেও যে সেই বিধিই প্রযোজ্য একথা উক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে কিছুতেই বুঝা যায় না। কুমারস্বামীও জানেন যে এই পদ্ধতি সাধকের জন্য নির্দিষ্ট তথাপি যতদূর মনে হয় একরূপ বিনা প্রমাণেই ওই পদ্ধতিতেই শিল্পী তাঁহার শিল্পের কল্পনা করেই এই সিদ্ধান্তের নির্দেশ করিয়াছেন : 'The whole process up to the point of manufacture belongs to the established order of personal devotion, in which worship is paid to an image mentally conceived'. (ধ্যাত্বা যজেত, *Transformation of Nature in Art,* p.6) কিন্তু মূর্তি বা প্রতিমাদি প্রস্তুতকালে শিল্পী যে আপন হৃদ্‌গহনে চিত্র-বস্তুটি ধ্যানের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতেন এবং এই ধ্যানের দৌর্বল্যবশত যে চিত্রের দুর্বলতা ঘটিত সে বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। 'শুক্রনীতিসার'-এ লিখিত আছে :

'ধ্যানযোগস্য সংসিদ্ধ্যৈ প্রতিমালক্ষণং স্মৃতম্।
প্রতিমাকারকো মর্ত্যো যথা ধ্যানরতো ভবেৎ॥
তথা নান্যেন মার্গেণ প্রত্যক্ষেণাপি বা খলু।'

তাৎপর্য্য এই—ধ্যানযোগের সম্যক সিদ্ধির জন্য প্রতিমা-নির্ম্মাতা যে ভাবে মূর্তিকে

ধ্যান করিবেন সেই ধ্যানস্থ স্বভাবই মূর্তির লক্ষণ। ইহা সাধন করিবার অন্য কোনও লক্ষণ বা উপায় নাই। কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্র'-তে বলিতেছেন :

'চিত্রগতায়ামস্যাং কান্তিবিসংবাদশঙ্কি মে হৃদয়ম্।
সম্প্রতি শিথিলসমাধিং মন্যে যেনেয়মালিখিতা॥'

তাৎপর্য এই—মালিবকাগ্নিমিত্রে রাজা পূর্বে মালবিকার ছবি দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন যে মালবিকা কখনও এত সুন্দর হইতে পারে না, পরে মালবিকাকে দেখিয়া মনে হইল যে, মালবিকার চিত্র হইতে মালবিকা অনেক সুন্দরী। এই প্রসঙ্গে রাজা বলিতেছেন যে, মালবিকাকে দেখিয়া মনে হইতেছে যে মালবিকার চিত্র যিনি আঁকিয়াছেন আঁকিবার সময় তাহার সমাধি শিথিল হইয়াছিল সেইজন্যই মালবিকার যথার্থ প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠে নাই। সাধারণত লোকে মনে করে যে কেবল অনুকৃতি করিতে, প্রতিকৃতি অঙ্কন করিতে কোনও ধ্যান বা সমাধির আবশ্যক হয় না, এই জন্য প্লেটোর ন্যায় অতবড়ো দার্শনিক পণ্ডিতও বলিয়াছিলেন যে প্রাকৃত সৌন্দর্যের অনুকরণে কোনও বৈশিষ্ট্য নাই কারণ তাহাতে কোনও বিশেষ মানসিক বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় না; যেমনটি আছে তেমনটি আঁকিয়া দিলেই হইল; কিন্তু প্রতিকৃতি অঙ্কন করিতে গেলেও চিত্রীর চিত্রের মধ্যে চিত্রের মানুষটি ধ্যান-ধৃত না হইলে যে তাহাকে বাহিরের রূপে ফুটানো যায় না, চিত্তাকারে পরিবর্তিত না হইলে সেই চিত্তের অনুরূপ মূর্তিকে ফুটাইয়া তুলা যায় না, এই গভীর তত্ত্বটি অনেক সময়ে আমাদের দৃষ্টিকে বঞ্চনা করে। 'পাতঞ্জল সূত্র'-তে লিখিত আছে : 'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপ-শূন্যমিব সমাধিঃ' অর্থাৎ 'ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব যদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধি রিত্যুচ্যতে', অর্থাৎ যখন ধ্যান ধ্যেয়বস্তুর আকারের দ্বারাই সাক্ষিরূপে প্রকাশ পায়, স্বতন্ত্র জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায় না এবং চিত্ত ধ্যেয়ের আকারে আকারিত হওয়াতে আমি জানিতেছি আমি ধ্যান করিতেছি এরূপ জ্ঞান যখন থাকে না তখন তাদৃশ জ্ঞানকে সমাধি কহে। এই সমাধিতে ধ্যাতৃ ধ্যেয় এবং ধ্যান এই তিনের জ্ঞান থাকে না, চিত্ত কেবলমাত্র ধ্যেয় বস্তুর আকারে আপনাকে প্রকাশ করে। কাজেই আমাদিগকে বলিতে হয় যে চিত্রী যখন চিত্র আঁকেন তাহার পূর্বে চিত্রের বস্তুকে ধ্যানের দ্বারা হৃদয়ে এমন করিয়া গ্রহণ করেন যাহাতে ধ্যাতা ও ধ্যেয়-বিবর্জিত ভাবে চিত্ত কেবলমাত্র চিত্রেয় বস্তুর আকারে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে। এই লক্ষণের সহিত পূর্বোক্ত বৌদ্ধ লক্ষণেরও এই অংশে সাদৃশ্য আছে যে সেখানে চিত্রকে ও চিত্তাকার বলিয়া মনে করা হইয়াছে। চিত্তাকার না হইলে চিত্রের উৎপত্তি হইতে পারে না, এ অংশে উভয়ের ঐকমত্য আছে; কিন্তু উভয়ের পার্থক্য এইখানে যে বুদ্ধঘোষ মনে করেন যে চিত্তাকারতাতেই চিত্রের পরিসমাপ্তি ও অভিব্যক্তি। বাহ্য চিত্রকরণে কেবল তাহার অনুকৃতিমাত্রই পরিলক্ষিত হয়। অথচ বর্তমান মতের উদ্দেশ্য তাহা নহে। চিত্তাকাররূপে যে চিত্র অন্তরে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকে বাহিরে রূপ দেওয়াই চিত্রীর কার্য। যে চিত্র চিত্রী বাহিরে আঁকিবেন তাহার বিষয়বস্তু কোনও দৃষ্ট পুরুষ প্রাণী বা বৃক্ষ-লতাদি হইতে পারে কিংবা তাহা শাস্ত্রোক্ত দেবদেবীর রূপ হইতে পারে কিংবা তাহা চিত্রীর মনোগত বা চিন্তিত

কোনও ভাব হইতে পারে। 'শিল্পরত্ন'-তে লিখিত আছে : 'দেবান্ বা মনুজান্ বাপি মৃগান্ নাগান্ বিহঙ্গমান্। লতাবৃক্ষাদিকান্ বাথ নাগান্‌বা সাগরানপি। শ্রোত্রাভ্যাং বাথ নেত্রাভ্যাং মনসা বাথ চিন্তিতান্। আলিখেৎ কিট্টলেখিন্যা সুমুহূর্তে সুলগ্নকে। স্বস্থচিত্তঃ সুখাসীনঃ স্মৃত্বা স্মৃত্বা পুনঃপুন' (২৪৮ পৃ.)। এই বচন হইতেও পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াটি উপলব্ধ হয়। চিত্রী যাহা কিছু দেখিয়াছেন, যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছেন, যাহা কিছু শুনিয়াছেন বারংবার স্মৃতিদ্বারা তাহা চিত্তে দৃঢ় করিয়া সেই দৃঢ়ীভূত চিত্তাবস্থাকে বাহিরে লেখনীদ্বারা প্রকাশ করিবেন। পুনঃ পুনঃ স্মরণেই সমাধির উৎপত্তি হয়। 'যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে' (১-২০) লিখিত আছে 'স্মৃত্যুপস্থানে চ চিত্তমনাকুলং সমাধীয়তে'। 'শিল্পরত্নে' (২৫৪ পৃ.) আরও লিখিত আছে যে এইরূপে চিত্তগত আকারকে বাহিরে ফুটাইয়া তাহাতে অনুরূপ ভাব ও সেই ভাবানুরূপ মুখ চক্ষু নাসিকা ওষ্ঠ হস্ত পদাদির চাঞ্চল্য বা ব্যাপার ফুটাইয়া তুলিবে এবং যথোচিত ক্রমে বর্ণবিন্যাস করিয়া নিম্নোন্নতাদি স্থানে বিনিবেশ করিবে। 'এবং স্বস্বোচিতং স্থানং মনসা নিশ্চিত্য বুদ্ধিমান্।

'লিখেচ্চিত্রগতং ভাবং তথা ব্যাপারমেব চ।
অথ বর্ণানি বিন্যস্য তত্র তত্রোচিতক্রমাৎ।
লেখিন্যা স্থূলয়া মন্দং নিষ্কলঙ্কং মহামতিঃ।
তত্র নিম্নোন্নতাদীনি বিশেষানি সমাচরেৎ।' (পৃ. ২৫৪)

অনেক সময় শাস্ত্রে এমনও উল্লেখ আছে যে যেখানে শিল্পী নিজে তাঁহার ধ্যানের দ্বারা মূর্তিকে গ্রহণ করিতে পারেন না সেখানে সাধক তাঁহার ধ্যানপ্রতিমাকে বা স্বপ্নপ্রতিমাকে তাঁহার ধ্যানানুসারে শিল্পীর দ্বারা নির্মাণ করান। অপ্রকাশিত পঞ্চরাত্র নারদ সংহিতাতে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে, যে :

ওঁ নমঃ সকললোকায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে।
বিশ্বায় বিশ্বরূপায় স্বপ্নাধিপতয়ে নমঃ॥

এই মন্ত্র জপ করিয়া স্বীয় ইষ্ট মূর্তির স্বপ্নদর্শনের জন্য নিদ্রাগত হইবে। এবং স্বপ্নে ইষ্টরূপ দর্শন করিলে তদনুসারে শিল্পিদ্বারা প্রতিমা প্রস্তুত করাইবে। পঞ্চরাত্রীয় ঈশ্বর-সংহিতায় সপ্তদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে শিল্পী স্বমূর্তি মন্ত্রের দ্বারা জপ হোমার্চনাদি করিয়া প্রথমে সেই মূর্তিকে সামান্যভাবে চিত্তের মধ্যে উদ্ভাসিত করিয়া মূর্তির উপাদানের অন্বেষণ করিবে।

সম্যক্ স্বমূর্তিমন্ত্রৈস্তু জপহোমার্চনাদিনা।
নয়েৎ সামান্যভাসিত্বং তথা তৎকাণার্চনাৎ॥

তারপর শিল্পের উপাদান সামগ্রীতে ও অন্যবিধ সামগ্রীতে বহুবিধ উপায়ে বহু পূজা পদ্ধতি দ্বারা পবিত্র করিবার কথা উল্লিখিত আছে। শিক্ষা কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে নানাবিধ পূজা পদ্ধতির বিধান আছে। এইরূপে শিলাখণ্ড আহরণ করিয়া শিলার অভ্যন্তরে সংরুদ্ধ মূর্তির উদ্দেশেও বহুবিধ পূজাপদ্ধতির উল্লেখ আছে :

ধ্যাত্বা শিলাং তৎ সংরুদ্ধংসংপূজ্য জুহুয়াত্ততঃ।

এমনি করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা দ্বারা যিনি যথার্থ কেবলমাত্র একস্বরূপ তাঁহার সাধন-সৌকর্যের জন্য নানা আকার ও অবয়বের মধ্য দিয়া পরিকল্পনা করায় সাধক ও শিল্পী কোনও অপরাধগ্রস্ত হন না।

ভিন্নৈরবয়বৈর্মানযুক্তৈঃ শিষ্টৈ র্ন দুষ্যতি।
ভক্তিশ্রদ্ধাবশাচ্চৈব সর্বং চার্ণময়ং যতঃ।
এবমেকতমস্যাপি ভক্তিপূর্বস্য বস্তুনঃ।
সংগ্রহঞ্চ পুরা কৃত্বা কুর্যাদাকারমীপ্সিতম্।

এই প্রসঙ্গে 'ঈশ্বর-সংহিতা'-য় ইহাও উল্লিখিত আছে যে অবয়বাদির পরাপর যথোপযুক্ত সামঞ্জস্য ও মানই সৌন্দর্যের কারণ :

'মানোন্মান-প্রমাণানাং অথ সৌন্দর্যসিদ্ধয়ে।'

অর্থাৎ যথোপযুক্ত মানাদির প্রয়োগেই সৌন্দর্যের সিদ্ধি হইয়া থাকে। সৌন্দর্য ছাড়া মূর্তির আর একটি ধর্ম তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, তাহাকে তাঁহারা বলেন লাবণ্য। সৌন্দর্য বা মনোহারিত্ব এবং রূপলাবণ্য এই দুইটি পৃথক ধর্ম। এবং একটি থাকিয়া অপরটি নাও থাকিতে পারে।

'মনোহারিত্বমেকত্র রূপলাবণ্যভূষিতম্।
সর্বদা চানয়োর্বিত্ত অন্যোন্যত্বেন সংস্থিতিম্।'

এই উভয়ের যে কোনও একটি থাকিলেই সে মূর্তিকে গ্রহণযোগ্য বলা যায়। তাহা হইলে এই কথা পাওয়া যাইতেছে যে শরীরাবয়বের সামঞ্জস্যের দ্বারা চিত্তের মধ্যে যে একটি বিশেষ অবস্থা উৎপন্ন হয় তাহাকেই সৌন্দর্য বলে। লাবণ্যের দ্বারা উৎপন্ন হয় হ্লাদকত্ব। সৌন্দর্য থাকিয়াও হ্লাদকত্ব না থাকিতে পারে। এই জন্য হ্লাদকত্ব বা সুখকে সৌন্দর্যের অব্যভিচারি ধর্ম বলিয়া পরিগণনা করা যায় না। অবয়বাদির সামঞ্জস্যের অতিরিক্ত ভাব ও রস ও ব্যাপারাদির যথাবৎ সমগ্র পরিস্ফূর্তিতে লাবণ্যের উৎপত্তি হয় এ জন্য অনেক স্থলে অবয়বাদির যথাবৎ সামঞ্জস্য না থাকিলেও যদি ভাব রস ব্যাপারাদির স্ফূর্তি থাকে তবে সেই মূর্তি হ্লাদপ্রদ হয়। এবং সেই সেই মূর্তিকে লাবণ্যময়ী বলা যায়। অতএব সৌন্দর্য না থাকিয়াও লাবণ্য থাকিতে পারে। 'ঈশ্বর-সংহিতা'-য় লিখিত আছে :

'স্ব-সৌন্দর্যস্তু মানস্য ক্বচিদাক্রম্য বর্ততে।
লাবণ্যস্য ক্বচিন্মানং সাবচ্ছাদ্যাবতিষ্ঠতে।
যথাভিরূপবান্ লোকে দরিদ্রো২প্যেতিমান্যতাম্।
বিরূপো২প্যতিবিত্তাঢ্যো নারূপো নৈব নির্দ্ধনঃ।
সা সম্যক্ প্রতিপন্নস্য বিম্বে দৃগ্‌গোচরে স্থিতে।
আমূর্ত্যাহ্লাদয়ত্যাশু জ্ঞাত্বৈবং যত্নমাচরেৎ।'

যাহা এইমাত্র বলা হইল তাহার দ্বারা এই কথা মনে হয় যে formal beauty বা অবয়ব সামঞ্জস্যের ফলে চিত্তের যে একটি বিশিষ্ট অবস্থা হয় তাহারই অনুভবকে সৌন্দর্যবোধ বলা

যায়। এই মতের সহিত গ্রিকদের formal beauty-র মতের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রিকেরা যাহা প্রকাশ করা আবশ্যক মনে করেন নাই, যথা ভাব, রস, এবং ব্যাপার, তাহাদের প্রকাশ এই মতে সৌন্দর্যপদবিতে গৃহীত হয় নাই। কিন্তু সৌন্দর্যের সহিত অবশ্য সংযোজ্য লাবণ্যাদি ধর্মরূপে তাহাদের প্রকাশ অবশ্য কর্তব্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে শিল্পরত্নে ও চিত্রসূত্রাদি গ্রন্থে রস, ভাব ও ব্যাপার চিত্রে অবশ্য প্রকাশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই ইহাদের সম্বন্ধে ২/১টি কথা বলা আবশ্যক। ভরত তাঁহার 'নাট্যসূত্র'-এ বলিয়াছেন, 'বিভাবানুভাবসঞ্চারিভাবযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ'— অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাবের সহযোগে রসনিষ্পত্তি হয়। রসনিষ্পত্তি শব্দের কী অর্থ তাহা লইয়া আলংকারিকদিগের মধ্যে অনেক বিবাদ আছে। ভট্টলোল্লট প্রভৃতিরা বলেন যে বিভাবাদির সহিত স্থায়ীভাবের সংযোগ হইয়া রসনিষ্পত্তি হয়। যাহাকে লক্ষ করিয়া রস উৎপন্ন হয় এবং সেই রসের উদ্দীপক বাহ্য ঘটনাবলি বা বিবিধ প্রাকৃতিক অবস্থাকে যথাক্রমে আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব বলা হয়। শৃঙ্গাররসে নায়ক-নায়িকা পরস্পরের আলম্বন, বসন্তকাল, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি প্রভৃতি উদ্দীপক। অনুভাব বলিতে বুঝা যায়, রসাবলম্বী ব্যক্তিদের বাহ্য চেষ্টা ও ইঙ্গিত, যাহা দ্বারা একের মনোভাব অন্যের নিকট প্রকট হয়। আর ব্যভিচারী বলিতে বুঝা যায় চিত্তের অসংখ্যেয় ভাবপরম্পরা যাহা রসের অনুবর্তী বা তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। ভট্টলোল্লট বলেন যে আমাদের চিত্তের মধ্যে যখন রতি, হাস, ভয়, ক্রোধ, উৎসাহ প্রভৃতি ভাব উদ্রিক্ত হয় তখন তাহা বিভাবানুভাবাদির দ্বারা উপচিত হইলে তাহাকে রস বলা যায়। দণ্ডী প্রভৃতিরও এই মতই ছিল। কিন্তু শ্রীশঙ্কুক বলেন যে বিভাবাদি পূর্বে না থাকিলে রসাবগতির সম্ভাবনা থাকে না। তিনি আরও বলেন যে বিভাবাদি কারণের দ্বারা যে সমস্ত অনুভাবাদি উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারাও স্বকীয় চিত্তে তাদৃশ বিভাবানুভাবের সহিত কীদৃশ শঙ্কা, ব্রীড়া প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব উৎপন্ন হয়, তাহা কল্পনা করিয়া দ্রষ্টা যখন অভিনেতার ভাবকে মনের মধ্যে উপলব্ধি করে, তখনই তাহাকে রস বলা যায়। এই রসের উৎপত্তি অন্য অন্য মিথ্যাপ্রত্যয়মূলক ভ্রমের দৃষ্টান্তে ব্যাখ্যা করা যায়। যে নট রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ সে রামও নয়, একেবারে যে অরাম তাহাও নহে, তৎসদৃশও নয়, বিসদৃশও নয় অথচ তাহার অভিনয়ের দ্বারা দ্রষ্টার মনে যে একটি বিশেষ ভাব উৎপন্ন হয় তাহাকেই রস বলা যায়। ছবির ঘোড়া যেমন ঘোড়াও বটে, ঘোড়া নয়ও বটে, এখানেও তেমনি একটা প্রতীতি হইতেছে সন্দেহ নাই, অথচ তাহা তত্ত্বও নহে, ভ্রমও নহে এইরূপ নানা বিরুদ্ধ মতির সংমিশ্রণে যখন সেই বিরুদ্ধতার বিরোধটুকু গৃহীত না হইয়া একটি অখণ্ড প্রতীতি জন্মে তাহাকেই রস কহে। ইহাকে যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এখানে ফলকথা এই দাঁড়াইল যে রসটি একটি অনুকরণ-সম্ভূত চিত্তবৃত্তি। কিন্তু অভিনব গুপ্ত বলেন যে বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী এইগুলি একত্র মিলিয়া চিত্তের যে একটি অভিদ্রুতি বা বিগলিত অবস্থা হয়, যাহাতে কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, বেদকত্ব একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় তাদৃশ অবস্থাকেই রসচর্বণা বা রসাস্বাদ বলা যায়। ইহা লৌকিক প্রয়োজন জন্য নয় বলিয়া ইহা অলৌকিক।

শিল্পশাস্ত্রে বলে যে কোনও চিত্রকে যখন আঁকিতে হইবে, তখন তাহার মধ্যে কোনও একটি বিশেষ রসচর্বণা চলিতেছে এইরূপেই তাহাকে আঁকিতে হইবে। যে চিত্রে অন্তরের কোনও বিশেষ ভাবের অনুভব ব্যঞ্জিত হয় না সেইরূপ চিত্র আঁকায় কোনও বিশেষ বিচ্ছিত্তি নাই। সেই সঙ্গে সঙ্গে কোনও একটি ভাবের উদয়, সন্ধি বা শবলতা ফুটাইয়া দিয়া রসের বিশিষ্ট অবস্থাটিও দেখানো প্রয়োজন মনে করা হইত। প্রত্যেক ভাবের সহিত শরীরের যে নানা স্পন্দন হয় তাহাও তাহার মধ্যে তাঁহারা প্রকাশ করিতে চাহিতেন। অভিনয় স্থলে বাক্যাংশের দ্বারা রসের অভিদ্যোতনা করা সহজেই সম্ভব, কিন্তু চিত্রে প্রকাশ করিতে হইলে তাহা কেবলমাত্র মুখভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি অঙ্গাদির ইঙ্গিতে প্রকাশ করা যায়। এইজন্য চিত্রশাস্ত্রে বহুবিধ দৃষ্টির বর্ণনা আছে। প্রত্যেকটি বিশেষ দৃষ্টি এক একটি বিশেষ ভাবকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। যথা ললিতা, হৃষ্টা, বিকাসিতা, ভয়ানকা, ভ্রুকুটি, সঙ্কুচিতা, যোগিনী, মন্দসঞ্চারিণী ইত্যাদি। অঙ্গুলি রাখিবার বিভিন্ন ভঙ্গির দ্বারাও বিভিন্ন প্রকারের মনোভাব জ্ঞাপন করা যাইত। 'অভিনয় দর্পণ'-এ আটপ্রকার দৃষ্টির কথা বর্ণিত আছে। কিন্তু 'সমরাঙ্গণ-সূত্রধার'-এর ৮৩ অধ্যায়ে চৌষট্টি প্রকার দৃষ্টির কথা বর্ণিত রহিয়াছে। ইহা ছাড়া নয় রকম মাথা হেলাইবার ও চারিপ্রকার গ্রীবা হেলাইবার ব্যবস্থা আছে। ৫১ প্রকারের হস্তভঙ্গির কথা নন্দিকেশ্বরের 'অভিনয় দর্পণ'-এ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক ভঙ্গিতে কী মনোভাব সূচনা করে তাহাও ওই সমস্ত গ্রন্থে বর্ণিত আছে। তাহা ছাড়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, মাতাপিতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর, ননান্দৃ, ভ্রাতা, পুত্র, স্নুষা প্রভৃতির হস্তাঙ্কনের বিশেষ ব্যবস্থাও প্রদর্শিত আছে। হাত রাখিবার ভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টির একটি গাঢ় সম্পর্ক আছে। দৃষ্টির সহিত মনের সম্পর্ক আছে, মনের সহিত ভাবের এবং ভাবের সহিত রসের সম্পর্ক আছে। তেমনি পাদবিন্যাসের সহিত করবিন্যাসেরও একটি নিয়ত সম্পর্ক আছে। 'অভিনয় দর্পণ'-এ নন্দিকেশ্বর লিখিয়াছেন 'যথা স্যাৎপাদবিন্যাসস্তথৈব করয়োরপি। বামাঙ্গভাগে বামস্য, দক্ষিণে দক্ষিণস্য চ।... যতো হস্তস্ততো দৃষ্টিঃ যতো দৃষ্টিস্ততো মনঃ। যতো মনস্ততো ভাবো যতো ভাবস্ততো রসঃ॥' ইহা ছাড়া পাদভঙ্গি ও স্থানভঙ্গি ও বিবিধ রীতির কথা উল্লিখিত আছে এবং দশ রকম গতির কথাও বর্ণিত আছে, যথা হংসী, ময়ূরী, মৃগী ইত্যাদি। এই সমস্ত শরীরভঙ্গিগুলি নাট্যের অনুভাব। ইহাদের দ্বারা চিত্রেয় বস্তুর হৃদ্‌গত ভাব ও রস প্রকাশ করা যাইত। সাধারণত নাট্যে ৮/৯ রকম রসের প্রসিদ্ধি আছে। যথা শৃঙ্গার, বীর, করুণ, রৌদ্র, হাস্য, অদ্ভুত, বীভৎস, ভয়ানক ও শান্ত। বৈষ্ণবেরা বাৎসল্য ও ভক্তিরসেরও উল্লেখ করিয়া থাকেন। 'সমরাঙ্গণ-সূত্র'-এ লিখিত আছে যে চৈত্রিক সমাজে প্রেমনামক প্রিয়দর্শনোত্থ আর একটি রসেরও প্রসিদ্ধি আছে। পূর্বোক্ত রসগুলি ছাড়া আর যে কারণেই মনে সহজে আনন্দ উপস্থিত হউক না কেন তাহাকে এই প্রিয়তা রসের মধ্যে অন্তর্ভাবিত করা যায়। প্রিয়তা রসের যে লক্ষণ 'সমরাঙ্গণ-সূত্র'-তে দেওয়া হইয়াছে তাহা এই :

'অর্থলাভ-সুতোৎপত্তি-প্রিয়দর্শনহর্ষজঃ।
সঞ্জাতপুলকোদ্ভেদো রসঃ প্রেমা সমুচ্যতে॥'

এই লক্ষণের সাধারণ অর্থ এই যে অর্থলাভ, সুতোৎপত্তি, প্রিয়ের বা প্রিয় বস্তুর দর্শনে যে আনন্দ হয় তাহা হইতে উৎপন্ন যে রসে মানুষের শিহরণ জাগে তাহাকে প্রেমরস বলে। পুংলিঙ্গ প্রেমশব্দের অর্থ প্রিয়তা এবং হর্ষ অর্থাৎ প্রিয়বোধ এবং হৃদয়দ্রাবিতাবোধ। সমরাঙ্গণ-সূত্রের লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে অন্য কোনও রসবিভাগের মধ্যে অনুক্ত, স্বার্থসম্ভূত বা নিঃস্বার্থ প্রিয়তাবোধজনিত বা হর্ষজনিত যে রস উৎপন্ন হয়, নাট্য অপেক্ষা চিত্রে তাহার উপযোগিতা অধিক। এইজন্য চিত্রপ্রয়োগবিষয়ে এই রসকে স্বতন্ত্র ভাবে স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু নাট্য অপেক্ষা চিত্রে এই রসের সমধিক উপযোগিতা কেন হইবে? নাট্যে ও দীর্ঘ বিরহের পর প্রিয়জনকে দেখিয়া আনন্দ উৎপন্ন হয়। কিন্তু সে আনন্দকে তাঁহারা শৃঙ্গারের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এখানে শৃঙ্গারেরও উল্লেখ হইয়াছে অথচ প্রেমরসকেও স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই জন্য অনুমান করিতে হয় যে প্রিয়শব্দ প্রিয়তা সাধারণ পর্যায়, অর্থাৎ যে কোনও প্রিয়বস্তু বা হৃদয়দ্রাবী বস্তুদর্শনে যে আনন্দ হয় তাহাকে প্রেমরস বলা হইয়াছে। নাট্যের মধ্যে রস যেমন উভয়াপেক্ষী চিত্রের মধ্যেও তাহাই। এই জন্য এক দিকে যেমন চিত্রেয় ব্যক্তির প্রিয়দর্শনজনিত রস চিত্রে ফুটাইতে পারা যায় এবং তাহাকে প্রেম নাম দেওয়া যায়, অপর দিকে তেমনি কোনও সুন্দর চিত্রদর্শনে দর্শকের চিত্তে যে হৃদয়দ্রাবী ভাব জন্মে, তাহাকেও প্রেম বলা যায়। আমরা ঈশ্বর-সংহিতার বচন হইতে দেখাইয়াছি, সৌন্দর্য ও লাবণ্যবিভূষিত চিত্র আহ্লাদ উৎপাদন করে। প্রেমরসকে স্বতন্ত্ররসরূপে গ্রহণ করায় এবং হার্দ ও প্রিয়তা এই রসের লাক্ষণিক স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হওয়ায় ইহাকে নিঃসংকোচে একটি স্বতন্ত্র চৈত্রিক রস বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কোনও একটি চিত্র দেখিয়া বা মূর্তি দেখিয়া আমাদের মনের মধ্যে শুধু তাহার সৌন্দর্য ও লাবণ্য বোধের দ্বারা যে আনন্দ ভালোলাগা বা দ্রুতহৃদয়তা উৎপন্ন হয় তাহা কেবলমাত্র একটি ভাব নহে কিন্তু তাহা একটি বিশেষ রস। কারণ অন্য সকল রসের ন্যায় লোকোত্তর চমৎকারিতাই ইহার প্রাণ এবং এই রসসম্ভোগকালে দ্রষ্টা ইহাতে এমন করিয়া ডুবিয়া যায় যে সে বেদ্যবেদকভাবশূন্য হয় এবং নিজের সহিত অভিন্ন ভাবে একটি সমাধির ন্যায় অবস্থায় এই রস আস্বাদন করে। ব্যভিচারি ভাবগুলির একটি আর একটিতে আসিয়া বিলীন হয়; ইহা কেবলমাত্র একটি ভাব নহে। ইহার মধ্যেই চিত্রগ্রহণ ব্যাপারের সমগ্র ফলটি রসাকারে অনুভূত হয়। ইংরাজিতে বলিতে গেলে ইহাকে বলিব aesthetic joy বা চৈত্রিক আনন্দ। ইহার বিভাব ও অনুমিত ব্যভিচারি ভাবগুলি চিত্র বস্তুর মধ্যেই পাওয়া যায়। এই বিভাবকেই স্ফুট করিবার জন্য প্রায়শ চিত্রে বা ভাস্কর্যে তরুলতা গুল্মাদি বা নানাবিধ জন্তু বা অন্য নানাবিধ মূর্তি আঁকিবার ব্যবস্থা আছে। দেবী দশভুজার মূর্তিতে দেবী বীররসের আলম্বন বিভাব। অসুর ও সিংহের পরস্পরের প্রতি বিকটতা ও অসুরের দেবীর প্রতি বিকটতা ও দেবীর দশভুজের দশ প্রহরণ সমস্তই উদ্দীপন বিভাবের কার্য করে। দেবীর ভ্রূভঙ্গি ও ভুজাক্ষেপ প্রভৃতি অনুভাবের কার্য করে। তত্তদনুভাবের দ্বারা অনুমিত ব্যভিচারি ভাবগুলি তাহার সহিত যুক্ত হইয়া দেবীর মধ্যে যে বীররস প্রকটিত করিয়াছে তাহা স্ফুট হইয়া উঠে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারা যায় য প্রাচীন দুর্গা মূর্তিতে সিংহ পাওয়া যায়

না। ময়ূরের উপরে বসা কার্তিক মহাশয় ও মূষিক বাহিত গণেশ প্রভুর এবং লক্ষ্মী সরস্বতী বা জয়া বিজয়ার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। বলা বাহুল্য যে চণ্ডীর কল্পনার সহিত এই মূর্তিগুলির সঙ্গতি নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সপ্তম শতাব্দীর Stuart Bridge Collection-এর ৭২ নং কৃষ্ণপ্রস্তরের মূর্তিটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা লন্ডনের British museum-এ রক্ষিত আছে ও রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের *Medieval Indian Sculpture* গ্রন্থে ইহার প্রতিকৃতি ছাপা হইয়াছে। চণ্ডীতে সিংহের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু কার্তিক গণেশ প্রভৃতির কোনও উল্লেখ নাই। বাংলাদেশে দশভুজার মূর্তির সহিত তাহাদের সংযোগ শৈল্পিক ব্যবস্থায় অসঙ্গত। পূর্বোক্ত দশভুজার মূর্তির মধ্যে যে একটি শান্ত বীরত্ব আছে তাহা আমাদের চিত্তকে দেবীর শান্ত শক্তির মহত্ত্বে ও উৎসাহে পূর্ণ করে, এবং সেই সঙ্গে সমগ্র মূর্তিটির অবয়ব-সামঞ্জস্য বস্তু-সন্নিবেশ-সামঞ্জস্য ও চারুতা আমাদের হৃদয়ে একটি অলৌকিক আনন্দ উৎপাদন করে। এই চিত্রগত আনন্দ প্রচলিত আটটি রসের আনন্দ হইতে পৃথগ্ জাতীয়। সেইজন্য ইহাকে পৃথগ্ ভাবে স্বীকার করিতে হয়। এই চৈত্রিক আনন্দকে 'প্রেমা' বলা যাইতে পারে। অনেকে, নাট্যজনিত যে অষ্টবিধ রসের উপভোগ হয়, তাহাকেও এই চৈত্রিক রসের অনুরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে চিত্রে যে উপায়ে চিত্রবস্তুর প্রকাশ হয়, নাট্যরস সম্ভোগও সেই উপায়েই হইয়া থাকে। শ্রীশঙ্কুক বলেন যে, চিত্রে চিত্রেয় বস্তুর রেখাদি দ্বারা অনুকরণ করা হয়; এই অনুকরণপ্রসূত চিত্র বস্তুত চিত্রেয় বস্তু হইতে বিভিন্ন। আবার ইহা তাহা হইতে একেবারে বিভিন্নও নহে। চিত্রেয় বস্তুর ন্যায়ই ইহার প্রতীতি হয়। অথচ তাহা হইয়াও তাহা নহে। এই চিত্রেয় বস্তুর সহিত অসাদৃশ্য ও সাদৃশ্য, এই দ্বিবিধ বিরোধ, চিত্রদর্শন সময়ে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মনকে পীড়িত করে না। এইজন্য চিত্রে চিত্রেয় বস্তুর জ্ঞান সম্যক জ্ঞানও নহে, মিথ্যা জ্ঞানও নহে, সংশয় জ্ঞানও নহে, সাদৃশ্য জ্ঞানও নহে। ইহা অন্যপ্রতীতিবিলক্ষণ। প্রতীতি বলিয়াই ইহাকে যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা যায় না। প্রতীতি বলিয়াই ইহা দ্বারা অর্থক্রিয়াও দৃষ্ট হয়। অভিনব গুপ্ত এই মতের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন : 'সম্যঙ্‌মিথ্যা-সংশয়-সাদৃশ্যপ্রতীতিভ্যো বিলক্ষণা চিত্রতুরগাদিন্যায়েন যঃ সুখী রামঃ, অসাবয়মিতি প্রতীতিরস্তীতি। তদাহ—

'প্রতিভাতি ন সন্দেহো ন তত্ত্বং ন বিপর্যয়ঃ
ধীরসাবয়মিত্যস্তি নাসাবেবায়মিত্যপি॥
বিরুদ্ধবুদ্ধিসম্ভেদাদবিবেচিতসম্প্লবঃ।
যুক্ত্যা পর্যনুযুজ্যেত স্ফুরন্ননুভবঃ কয়া॥'

('নাট্যশাস্ত্র', ২৭৫ পৃ.)

শ্রীশঙ্কুক বলেন যে, নাট্যে নট অভিনেয় পুরুষের রসকে অনুকরণ করেন, চিত্রী যেমন অনুকরণ করেন চিত্রেয় বস্তুকে, 'অনুকরণরূপো রসঃ'। কাজেই তাঁহার মতে চিত্রেয় বস্তুর অনুকরণের ন্যায় একদিকে যেমন নট অভিনেয় পুরুষের রস অনুকরণ করে অপরদিকে তেমনি দর্শক নটের রস অনুকরণ করে। কিন্তু অভিনব গুপ্ত বলেন যে, নটের পক্ষে

অভিনেয় রামাদি পুরুষের রস অনুকরণ করা সম্ভব নহে। প্রত্যক্ষ যাহা দেখা যায় তাহারই অনুকরণ সম্ভব। রোমঞ্চগদ্‌গদাদির, ভুজাক্ষেপ প্রভৃতির ও ভ্রূক্ষেপ কটাক্ষাদির অনুকরণ সম্ভব। কিন্তু রসের প্রাণভূত রতি একটি চিত্তবৃত্তি, তাহার অনুকরণ সম্ভব নহে। নটের চিত্তবৃত্তিও দর্শকেরা অনুকরণ করিতে পারেন না। কারণ চিত্তবৃত্তিকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানা যায় না। যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানা যাইত তবে অনুকরণেরও প্রয়োজন হইত না। প্রত্যক্ষদৃষ্ট বহিরবয়বের অনুকৃতি সম্ভব। কিন্তু কাহারও অন্তরের রস কেহ সাক্ষাৎ করিলে তাহার হৃদয়ই সেই রসাপন্ন হয় এবং সেইজন্যই সেই রসের পুনরণুকরণের সম্ভাবনা থাকে না। নট, অভিনেয় পুরুষের বাহ্যগুণ, অল্প চেষ্টায় অনুকরণ করিতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয়রসের সহিত তার সাক্ষাতও হয় না, অনুকৃতিও হয় না।

এই তর্কাবলী হইতে দেখা যায় যে, শ্রীশঙ্কুক মনে করিতেন যে, যে প্রণালীতে, যে অন্তঃসহানুভূতিতে, চিত্রী তাঁহার চিত্র অনুকারের দ্বারা ফুটাইয়া তুলেন, সেই জাতীয় সহানুভূতি দ্বারাই কাব্য ও নাট্যের রস রসিকের হৃদয়কে বিদ্রুত করে। চিত্রশিল্পের সত্তা যেমন একটি অলৌকিক সত্তা, কাব্যনাট্যের সত্তাও তেমনি একটি অলৌকিক সত্তা এবং উভয় স্থলেই রসোদ্‌গমের পদ্ধতি একই প্রকারের। অভিনব গুপ্ত কাব্যনাট্যাদির রস হইতে চিত্রগত অনুকারাদিজনিত আহ্লাদকে পৃথক করিয়া বলেন যে, 'গ্রীবাভঙ্গাভিরামং' শ্লোকটি পড়িলে যে মৃগপোতকের ছবি হৃদয়ে ফোটে, তাহা কোনও বিশেষ মৃগপোতকের নহে, তাহা কোনও দেশের মৃগপোতক নহে, তাহা কোনও কালেরও বিশেষ পোতক নহে। এইরূপে বিশেষ দেশ কালাদির সহিত অসংযুক্তভাবে (দেশকালাদ্যনালিঙ্গিতং) যে একটি ভীত মৃগশাবকের ছবি বিদগ্ধ পাঠকের চিত্তকে অনুরঞ্জিত করে, সেখানে সেই ভয় ব্যাপারটির সহিতও কোনও দেশকালাদির সংযোগ থাকে না; সর্ববিশেষ-বর্জিত বলিয়া যখন এই ভয়-স্বরূপটি চিত্তে প্রতিভাত হয়, তখন সেই ভয়ের সহিত পাঠক আপনাকে এক করিয়া দেখিতে পারে এবং কালিদাস বর্ণিত মৃগের ভয় যেন তাহার হৃদয়কে ভয়ার্ত করিয়া তুলে এবং প্রত্যেকের হৃদয়ে ভয়ের যে চিরন্তন বাসনা সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে তাহা উদ্রিক্ত হইয়া তাহার পরিপোষক হয়। এই অলৌকিক ভয় হইতে কম্পাদি বিকার উৎপন্ন হয়। তাহাকেই অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন, 'চমৎকার'। ('চমৎকারস্তজ্জোঽপি কম্পপুলকোল্লু-কসনাদির্বিকারশ্চমৎকারঃ।' 'নাট্য শাস্ত্র-টীকা', Gaekwad's *oriental series,* পৃ. ২৮১) জগন্নাথ 'রসগঙ্গাধর'-এ চমৎকার শব্দের সম্পূর্ণ অন্য অর্থ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গেই অভিনব গুপ্ত, বোধ হয় পূর্ব অর্থে অতৃপ্ত হইয়া, চমৎকার শব্দের অন্য আর একটি অর্থ দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, রসভোগকালে মনের যে একটি বিশেষ স্বভাবের দ্বারা রসসাক্ষাৎকার, রসাধ্যবসায়, সংকল্প বা সঙ্গতি ঘটে তাহারই নাম চমৎকার। কালিদাস যেমন শকুন্তলায় বলিয়াছেন, 'তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং'; সেখানে এই স্মরণ তার্কিক প্রসিদ্ধ স্মরণ নয়, এটা একটা সাক্ষাৎকার-স্বভাব প্রতিভান।— ''ভুঞ্জানস্যাদ্ভুতভোগাত্মস্পন্দাবিষ্টস্য চ মনঃকরণং চমৎকার ইতি। সচ সাক্ষাৎকারস্বভাবো মনসোঽধ্যবসায়ো বা সংকল্পো বা স্মৃতির্বা তথাত্বেন স্ফুরন্নস্তু।' দেশ কালাদির অসংসর্গিতাই

রসের অলৌকিকতা। ফলে চমৎকার, রসন, আস্বাদন, ভোগ, সমাপত্তি, লয়, বিশ্রান্তি প্রভৃতি শব্দের দ্বারা একই রসাস্বাদনকে জ্ঞাপিত করা হয়। বর্তমানকালে কাব্যরসের ভোগ সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রসিদ্ধ আছে। সেই মতগুলির সহিত আমাদের দেশের এই মত ও এতজ্জাতীয় অন্য মতগুলির কীরূপ সম্বন্ধ তাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব। বর্তমানে আমাদের বক্তব্য এই যে, শ্রীশঙ্কুক ও অভিনব গুপ্তের মতের পার্থক্য এইখানে যে, শ্রীশঙ্কুক বলেন যে, অনুকরণের দ্বারা রসের উৎপত্তি হয়, আর অভিনব গুপ্ত বলেন, বিভাবাদির প্রতীতি দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে দেশকালাদি সহযোগে কাব্যবস্তু গ্রহণ করিতে গিয়া যে সমস্ত বিঘ্ন আমরা উৎপন্ন করিতে পারিতাম সেগুলি দূর হওয়াতে দেশকালাদিবিশেষবর্জিত ন্যাট্যবস্তু ও তাহার রসের ভান হয়। কিন্তু নাট্যবস্তুর রস-ভান সম্বন্ধে বিপ্রতিপত্তি থাকিলেও চিত্রগ্রহণকালে অনুকৃতি সম্ভূত যে একটি রস উৎপন্ন হয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। অভিনবগুপ্ত শ্রীশঙ্কুককে তিরস্কার করিতে গিয়া এইমাত্র বলিয়াছেন যে চিত্রে যে প্রণালীতে রস উৎপন্ন হয়, নাট্যে বা কাব্যে সে প্রণালীতে তাহা হইতে পারে না। কিন্তু কতকগুলি অবয়ব-সন্নিবেশের দ্বারা চিত্রেয় বস্তুর সদৃশ চিত্র অঙ্কন করিলে চিত্রীর হৃদয়ে ও দর্শকের হৃদয়ে যে একটি আনন্দ হয় ও সেই আনন্দও যে লোকোত্তরচমৎকার-প্রাণ ও দেশকাল-বিশেষাদ্যনালিঙ্গিত-স্বভাব, তাহা সর্বজনপ্রতীতিপ্রমাণক। এই জন্যই এই আনন্দকে রস পর্যায়ভুক্ত না করিয়া পারা যায় না। অথচ কেবল নাট্যরসের দ্বারা ইহা সুগৃহীত হইল বলিয়া বলা যায় না। একথা বলা চলে যে কবি যেমন তাঁহার কাব্যে শৃঙ্গার বীর হাস্য করুণ প্রভৃতি রস ভাষায় ফুটাইয়া তুলেন শিল্পীও তেমনি ওই সমস্ত রস পাথরের ভঙ্গিতে বা রেখা ও বর্ণভঙ্গিতে প্রকাশ করেন। চিত্রী যদি সেই সমস্ত রস সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করেন তবে দর্শকের মনে কাব্যরসজাতীয় রসোৎপত্তির কি প্রতিবন্ধ হইতে পারে তাহা কল্পনা করা যায় না। আমরা 'উত্তররামচরিত'-এ চিত্রদর্শন প্রস্তাবে পড়িয়াছি যে, বনবাসের নানা চিত্র দেখিয়া জানকী ভয়শোকাদিতে আপ্লুত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কাজেই এই জাতীয় রস সম্বন্ধে চিত্রপ্রণোদিত রস ও কাব্য-নাট্য-প্রণোদিত রসের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে ইহা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই সমস্ত রসের দিক ছাড়িয়া দিলেও কেবলমাত্র অবয়বানুকৃতির সৌন্দর্যের দ্বারা আমাদের চিত্তে সামঞ্জস্য বাসনার পরিপোষকতায় যে আনন্দ উৎপন্ন হয় সেই সৌন্দর্যের আনন্দকে কোনও নাট্যরসের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এইজন্যই শিল্পশাস্ত্রে এতাদৃশ সৌন্দর্যবোধস্থলে যে রস হয় তাহাকে একটি স্বতন্ত্র স্থান দিতে বাধ্য হইয়া তাহাকে 'প্রেমা' এই নাম দিয়াছেন। এই প্রেমাকে রস না বলিয়া উপায় নাই, কারণ এই সামঞ্জস্য বোধের দ্বারা চিত্রীর চিত্তে যে আনন্দ উৎপন্ন হয় তাহা লোকোত্তর-চমৎকার-প্রাণ হ্লাদময় বেদ্য-বেদক-স্পর্শশূন্য এবং দেশকাল-বিশেষাদ্যনালিঙ্গিত স্বভাব। কেবলমাত্র কোনও পুরুষের বা কোনও নারীর কোনও একটা বিশেষ অবস্থার (নিদ্রিত বা উপবিষ্ট বা চিন্তিত) যথাস্বরূপ একটা চিত্র আঁকিলে ও তাহাতে শৃঙ্গারাদি কোনও রসাভিনিবেশ না করিলেও, কেবলমাত্র চিত্রের সৌষ্ঠব ও লাবণ্য প্রযুক্ত আমাদের চিত্তে যে হর্ষ উৎপন্ন হয় তাহা কোনও বিশেষ নারীকে অবলম্বন করিয়া নয়। তাহা

সেই চিত্রসৃষ্টিকে অবলম্বন করিয়া আমাদের চিত্তের সামঞ্জস্য বাসনাকে এমন করিয়া উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে যে, নরনারীর বা নারী শরীরের যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য আমাদের চিত্তের মধ্যে সুপ্তপ্রায় হইয়াছিল তাহার সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিয়া একটা অলৌকিক আনন্দ উৎপন্ন করে। এই জন্য কেবল অনুকৃতিমূলক প্রাকৃতিক চিত্রও বিশেষ বস্তু স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া একটা অলৌকিক বস্তু স্বভাবের মধ্যে আমাদিগকে উপনীত করে। Roger Fry, 'La Blonde Endormie', (নিদ্রিত সুন্দরী) চিত্রটি সম্বন্ধে বলিতে গিয়া বলিয়াছেন :

'In the Blonde Endormie belonging to M. Matini, Courbet for once was true to his principles and has accepted the thing seen in its ture setting, and here we are in the world of pure imagination. However 'realistic' this is we are not tempted ever to refer to what is outside the picture. The plastic unity holds us entirely within its own limits, because, at every point it gives us an exhilarated and surprised satisfaction. Everything here is transmuted into plastic terms and finds therin so clear a justification that we are not impelled to go beyond them or to fill them out, as it were, by thinking of the model who posed more than half a century ago to M. Courbet in Paris, or of any other woman whatever' (*Transformations,* P.37)

এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। প্রমিতি বা প্রমাণ শব্দ সাধারণত দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটা অর্থ, দীর্ঘ হ্রস্বাদি মাপ ও অপর অর্থ, বিশেষ বিশেষ জ্ঞান প্রক্রিয়া বা জ্ঞানোপায়, যেমন প্রত্যক্ষ অনুমান ইত্যাদি।

যে জাতীয় প্রক্রিয়া দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত বস্তুর সন্নিকর্ষ বা মিলন ঘটে, অথবা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারে অন্তঃকরণবৃত্তির সহিত বস্তুর মিলন ঘটে এবং তাহার ফলে নির্বিকল্পাদি ক্রমে কিংবা একেবারেই বিশিষ্টাবগাহী সবিকল্পক জ্ঞান জন্মে তাহাকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ কহে। এই জ্ঞানের দ্বারা যথাস্থিত বস্তুর রূপাদি জ্ঞান ঘটিয়া থাকে। আবার অব্যভিচরিত ব্যাপ্তিসম্পন্ন সাধন জ্ঞান দ্বারা সাধ্য সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। যেখানে ধূম থাকে সেইখানে বহ্নি থাকে, এইজন্য ধূম দেখিয়া বহ্নির অনুমান করা যায়। প্রত্যক্ষে যে উপায়ে জ্ঞান হয় অনুমানের জ্ঞান প্রক্রিয়া তাহা অপেক্ষা ভিন্ন এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতীতির স্বভাব, অনুমান জ্ঞানের প্রতীতির স্বভাব হইতে বিভিন্ন। প্রত্যক্ষে যে সাক্ষাৎকার আছে অনুমানে তাহা নাই। জ্ঞান প্রক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য অনুসারে ও প্রতীতি স্বভাবের বৈলক্ষণ্য অনুসারে প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে দুইটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ জাতীয় প্রতীতি দ্বারা অনুমান জাতীয় প্রতীতি পাওয়া যায় না, অনুমান জাতীয় প্রতীতি দ্বারা প্রত্যক্ষ জাতীয় প্রতীতি পাওয়া যায় না। বৃত্তি-বৈজাত্য ও ফল-বৈজাত্য এই উভয় রীতিতেই প্রমাণ ভেদ নির্ণয় করা যায়। বেদান্ত-পরিভাষাকার লিখিয়াছেন : 'ননু কথং বৈজাত্যং বিনা প্রমাণভেদঃ ইতি চেন্ন, বৃত্তিবৈজাত্যমাত্রেণ প্রমাণ-বৈজাত্যোপপত্তেঃ' ('বেদান্ত-পরিভাষা'; বেঙ্কটেশ্বর প্রেস্, ৩২২ পৃ.)। প্রত্যক্ষ এবং অনুমান যেমন দুইটি বিভিন্ন প্রমাণ, উপমানকেও তেমনি নৈয়ায়িক মীমাংসক ও বেদান্তী

স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। 'ন্যায়-সূত্র'-এ লিখিত আছে : 'প্রসিদ্ধসাধর্ম্যাৎ সাধ্যসাধনমুপমানম্।' প্রসিদ্ধ সাধর্মের দ্বারা কোনও অপ্রসিদ্ধ সাধ্যের সাধনকে উপমান কহে। বৃদ্ধ নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, কোনও নগরবাসী ব্যক্তি গবয় নামক জন্তুর সহিত পরিচিত নহেন কিন্তু তিনি জানেন, গবয় জন্তু অরণ্যে থাকে এবং তাহা দেখিতে গোরুর ন্যায়। পরে অরণ্যে গবয় দেখিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে ইহাই গবয়। এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ গবয়ে গো-সাদৃশ্যের দর্শন। গবয়ে গো-সাদৃশ্য দর্শন করিয়া ও গো-সদৃশ জন্তুকে গবয় বলে ইহা স্মরণ করিয়া অরণ্যের অজ্ঞাত প্রাণীটিকে তিনি যে গবয় বলিয়া চিনেন এবং গবয় এই নাম বা সংজ্ঞার সহিত তজ্‌জ্ঞাপ্য গবয় এই সংজ্ঞী প্রাণীর সহিত যে সম্বন্ধ স্থাপন করেন ইহাকেই উপমান কহে। উপমান প্রমাণের ফল সংজ্ঞা-সংজ্ঞি সম্বন্ধ-প্রতীতি। উপমান প্রমাণের মূল এইখানে যে সারূপ্য জ্ঞানের দ্বারা নূতন বস্তুর সহিত পরিচিত হওয়া। প্রমাণ মাত্রেরই উদ্দেশ্য, জ্ঞানবৃদ্ধি বা নূতন জ্ঞান সঞ্চয়। উপমান প্রমাণে আমরা সারূপ্যের দ্বারা অজ্ঞাত নূতনের সহিত আমাদের পরিচয় সম্পন্ন করিয়া থাকি। বৃদ্ধ নৈয়ায়িকের সহিত মধ্যযুগের নৈয়ায়িকের এই বিষয়ে একটু মতভেদ ছিল। তাঁহারা বলিতেন যে গো-সদৃশ গবয় এই সারূপ্য প্রতিপাদক বাক্য হইতেই অজ্ঞাত গবয়কে গবয় বলিয়া সংজ্ঞা-সংজ্ঞি সম্বন্ধে চিনি। এই সংজ্ঞা-সংজ্ঞি-সম্বন্ধপ্রতীতি উপমানের ফল। আর সারূপ্য প্রতিপাদক গো-সদৃশ গবয় এই অতিদেশ বাক্যকে উপমান প্রমাণ বলেন। আর মধ্যযুগের নৈয়ায়িকেরা বলেন যে ইন্দ্রিয় দ্বারাই সারূপ্যজ্ঞান নিষ্পন্ন হইয়া থাকে কাজেই সে অংশ প্রত্যক্ষ; সেই প্রত্যক্ষের বলে অতিদেশ বাক্য স্মরণ করিয়া যে সংজ্ঞা-সংজ্ঞি সম্বন্ধের প্রতিপত্তি হয় তাহাই উপমানের ফল। তাহা হইলেই ন্যায়-সূত্রের অর্থ হইল, প্রসিদ্ধ গোপিণ্ডের সাধর্মের দ্বারা সংজ্ঞী গবয়পিণ্ডের সহিত গবয় এই নামের সম্বন্ধের (সাধ্যের) বোধন বা সাধনের নাম উপমান। বেদান্তী ও মীমাংসক বলেন যে অরণ্যে পূর্বে অদৃষ্ট নূতন একটি জন্তু দেখিয়া তাহার সহিত গোর সাদৃশ্য নয়ন গোচর করিয়া পুনরায় নগরে ফিরিয়া আসিয়া যখন গোতে অরণ্যদৃষ্ট সেই গবয়ের সাদৃশ্যের প্রতীতি হয় সেই অনিন্দ্রিয়জ সাদৃশ্য প্রতীতির নাম উপমিতি। বেদান্ত পরিভাষার শিখামণি টীকাকার বলিয়াছেন যে উপমিতির মধ্যে কোনও ব্যাপার নাই। দৃষ্ট সাদৃশ্য হইতে অদৃষ্ট সাদৃশ্যের যে প্রতীতি তাহাকেই উপমিতি কহে। উভয় মত একত্র করিলে ফলে তাৎপর্য হইল এই যে একটি সাদৃশ্য জ্ঞানের দ্বারা আমরা আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে পারি কিংবা যখন আমরা একটি সাদৃশ্যের দ্বারা অপর একটি সাদৃশ্য উপলব্ধি করিতে পারি তখনই তাহাকে উপমান প্রমাণের বিষয়ীভূত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে এই উপমান প্রমাণের সহিত চিত্র প্রস্তাবের সম্বন্ধ কী? চিত্রে কয়েকটি রেখা বা বর্ণ সন্নিবেশের দ্বারা আমরা যখন কোনও প্রাণী বা বৃক্ষলতাদির রূপ আঁকি, তখন একদিকে চলে মনোব্যাপার যাহাদ্বারা আমরা অন্তরের মধ্যেই চিত্রেয় বস্তুর সাদৃশ্য ধ্যানযোগে গ্রহণ করিয়া থাকি এবং বাহিরে রেখাদি দ্বারা তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়া সেই রেখাঙ্কিত চিত্র বস্তুর সহিত অন্তর্গৃহীত সাদৃশ্যের অনুরূপতা অনুভব করি। অপর

দিকে দর্শকেরা চিত্রিত বস্তুতে তাহাদের পূর্বদৃষ্ট তৎসজাতীয় বস্তুর সাদৃশ্য গ্রহণবলে চিত্রিত বস্তুকে তত্তদ্বস্তু বলিয়া বুঝিতে পারি। শ্রীশঙ্কুক বলিয়াছেন যে, চিত্রিত বস্তুর জ্ঞান সম্যকও নহে, মিথ্যাও নহে, সংশয়ও নহে, কিন্তু এতাদৃশ প্রতীতি উৎপন্ন হয় ইহা অবিসংবাদিত সত্য বলি। কোনও যুক্তিবলে ইহার বিরুদ্ধে কোনও পর্যনুযোগ সম্ভব নহে। যদি আমরা বস্তু দেখিবার কালে ছাড়া তাহার অবয়ব-সম্বন্ধের স্বতন্ত্ররূপ মনে না করিতে পারিতাম তাহা হইলে চিত্রব্যাপার অসম্ভব হইত। চিত্রী যখন দুষ্মন্তের শরভয়কাতর মৃগশাবকের ছবি আঁকে তখন তাহার সম্মুখে কোনও মৃগশাবক উপস্থিত থাকে না, সে হয়তো কোনও সময় কোনও ভীত মৃগশাবক কিংবা ভীত কুক্কুর দেখিয়াছে কিন্তু সেই বিশেষ মৃগশাবক বা কুক্কুর তাহার সমগ্র বৈশিষ্ট্যে ও স্বালক্ষণ্যে তাহার চিত্তের মধ্যে উপস্থিত নাই, অথচ তাহার অবয়ব-সন্নিবেশ ও ভয়কালে অবয়ব-সন্নিবেশের বৈচিত্র্য ও মুখভাবের বিকার তত্তদ্দেশকালানালিঙ্গিত স্বভাবে তাহার মনের মধ্যে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে। হয়তো তাহা তাহার সংস্কারের তলদেশে প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। যেমন সে একটি একটি অবয়বকে মনের সামনে ধরিতেছে তেমনি তাহারই উদ্বোধকতায় অন্য অন্য অবয়ব সন্নিবেশের ছবি তাহার মনে ফুটিয়া উঠিতেছে। ধ্যানধৃত এই ছবিটিকে সে যখন রেখাদ্বারা রূপ দিতে চেষ্টা করে, তখন প্রত্যেকটি রেখাপাতের সহিত তাহার ধ্যানধৃত রূপটিকে মিলাইয়া লয় যে তাহা তাহার মনের ছবির অনুরূপ হইতেছে কি না। এমনি করিয়া সমগ্র ছবিটি ফুটাইয়া তুলিয়া সে যখন নিশ্চিতভাবে তাহার মনের চিত্রের সহিত চিত্রিত বস্তুর ঐক্য উপলব্ধি করিতে পারে তখন সে তাহার চিত্রাঙ্কণ সিদ্ধ হইল বলিয়া মনে করে। অন্য দর্শকেরাও সেই চিত্র দেখিয়া তাহাকে ভীত মৃগশাবক বলিয়া চিনিতে পারে। কিন্তু চিত্রিত বস্তুতে আমরা দেখি কেবলমাত্র কয়েকটি রেখার সন্নিবেশ বা বর্ণ-সন্নিবেশ। এই রেখা কয়েকটির সন্নিবেশ এবং বর্ণ-সন্নিবেশের সহিত প্রকৃত মৃগের সাদৃশ্য কোথায়? জয়ন্ত বলিয়াছেন সদৃশ-প্রতীতি-হেতু যাহা তাহাই সাদৃশ্য। কিন্তু সদৃশ-প্রতীতির কি হেতু তাহা নির্ণয় করিতে কোনও চেষ্টা করেন নাই। কেন কয়েকটা রেখার দ্বারা মাংসবহুল স্থূল সজীব একটা মৃগকে আমরা ফুটাইয়া তুলিতে পারি ইহার তত্ত্বের কোনও ব্যাখ্যা দেখা যায় না। আমাদের মন যে ভাবে প্রাকৃত বস্তুকে গ্রহণ করে তাহার মধ্যে এমন একটা গ্রহণ বর্জনের রীতি আছে যাহা আমাদের জ্ঞাত চেতনার অন্তরালে আপন ব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে। বাহ্য জগৎ জড়, রূপ-বহুল, স্পর্শযোগ্য, কঠিন ও ঘাত-প্রতিঘাত-সহ। তাহার সহিত জ্ঞান পথে যে আমাদের পরিচয় হয় তাহাতে তাহার সেই সম্পূর্ণ রূপ জ্ঞানাকারের মধ্যে গৃহীত হইতে পারে না। কারণ জ্ঞানের মধ্যে স্থৌল্যাদি কোনও ধর্ম নাই। কোনও বস্তু গ্রহণ সময়ে আমাদের চিত্তের মধ্যে সেই বস্তু যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ তদনুরূপ সম্বন্ধ-পরম্পরা উৎপন্ন করে তাহাই আমাদের জ্ঞানের মধ্যে বিধৃত হইয়া থাকিতে পারে। যখন পূর্বপরিচিত বন্ধুকে দেখিয়া মনে হয় 'এই যে তিনি' তখন তাঁহার দর্শনের দ্বারা আমাদের অন্তরস্থ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া আমাদের মধ্যে তাঁহার অবয়বাদির যে সামঞ্জস্য গৃহীত হইয়াছিল তাহাকে প্রকাশিত করে। এবং তাহারই বলে অদৃষ্ট ও দৃষ্টের যে পরিচয় ঘটে তাহা দ্বারাই আমার

বন্ধুকে আমি চিনিতে পারি। ভারতীয় দার্শনিকেরা প্রায় সকলেই সাদৃশ্য জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়জ বলিয়াছেন। কিন্তু বস্তুত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কেবলমাত্র বস্তুর প্রত্যক্ষস্বরূপ জানা যায়। এই প্রত্যক্ষস্বরূপের সহিত সংস্কারোদ্বোধিত স্মৃতিরূপাপন্ন বা কেবল সংস্কারাবস্থ ঈষদুদ্বোধিত চিত্তাবস্থার মধ্যে যে সমস্ত সম্বন্ধ পরম্পরা ঈষদুদ্বোধিত হইয়া উঠিয়াছে তাহারই সহযোগে চিত্তের যে ব্যাপার ঘটে তাহাদ্বারাই সাদৃশ্য-বোধ জন্মিতে পারে। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে যদিও উপমানকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তথাপি এই প্রমাণকে কোনও গুরুতর দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপযোগী করিয়া তোলা হয় নাই। বস্তুত এই প্রমাণটির যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে ইহার তাৎপর্যকে একটু বিশেষ ভাবে অগ্রসর করিতে হয়। এই প্রমাণমতে দৃষ্ট সাধর্মের দ্বারা অদৃষ্টবস্তুর স্বরূপ বা পরিচয় লাভ করা যায়। এই যে দৃষ্ট এবং অদৃষ্টের মধ্যে সাধর্ম ইহার পরিমাণ কতটুকু তাহার কোনও নির্ণয় নাই। কতটুকু সদৃশতা থাকিলে একটা হইতে অপরটার পরিচয় পাওয়া যায় তাহার স্বরূপ কেহ লক্ষণের দ্বারা বুঝাইতে পারেন না। সে পরিচয় নিজের অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য উপায়ে হওয়া সম্ভব নহে। তবে একথা হইতে আমাদের এই প্রতীতি জন্মে যে কোনও বস্তুর গ্রহণকালে তাহার অবয়বের যে দৈশিক সংস্থান আমাদের চিত্তের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায়, সর্বাংশে তৎসমধর্মী না হইলেও তাহার সহিত কতকগুলি বিশিষ্ট অংশে মিল থাকিলেই তাহাকে সদৃশ বলিয়া বোধ হয়। আমরা জীবনে অনেক পাতা দেখিয়াছি। যদি তালপাতা, নারিকেল পাতা, কলাপাতা, এবং গাঁদাপাতার পরস্পর কী সাদৃশ্য আছে যাহার বলে তাহাদের প্রত্যেককেই পাতা বলে ইহার বিচার করিতে যাই তবে তাহার সঠিক উত্তর দেওয়া বড়ো সহজ হয় না। অথচ আমাদের চিত্ত আমাদের অজ্ঞাতে তাহাদের দৈশিক প্রতীতি ও সংস্থানের মধ্যে এমন কিছু লক্ষ করিয়াছে যাহাতে একটির সাদৃশ্যে অপরটিকে চিনিতে পারে এবং সম্পূর্ণ কোনও অজ্ঞাত পাতা দিলেও তাহাকে পাতা বলিয়া চিনিতে ভ্রম হয় না। আবার কোনও শিল্পী যদি নিছক কল্পনার দ্বারা এমন একটি পাতা অঙ্কিত করেন যাহার তুল্য পাতা কোথাও নাই, তথাপি সেই অঙ্কিত পাতাটি দেখিয়া পাতা বলিয়া চিনিতে আমদের কোনও ক্লেশ হয় না। তবেই দেখা যাইতেছে যে, যে জাতীয় অবয়বসংস্থানকে আমরা পাতা বলি, সেই সংস্থানের মধ্যে যে বিশিষ্টজাতীয় দৈশিক সম্বন্ধ আছে এবং যে ভিন্ন ভিন্ন নানাপ্রকার দৈশিক সম্বন্ধের সংযোগ বিয়োগে একটি পাতার সংস্থান গড়িয়া উঠিয়াছে, সেগুলি একান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ নহে। আমাদের মনের মধ্যে কোনও বিশিষ্ট রীতিতে সেইগুলি আমরা বহুলভাবে পরিবর্তন করিলেও ‘পাতা’ এই সাদৃশ্যবোধটি থাকে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় এই, যে আমাদের চিত্ত কেবলমাত্র যে বহির্বস্তুর যথাস্থিত দৈশিক ছাপ গ্রহণ করে তাহা নয় কিন্তু তাহার কোনও বিশিষ্টজাতীয় অন্তর্ব্যাপারে সেইগুলিকে এমনভাবে পরিবর্তিত করিতে পারে যাহাতে বহিঃস্থিত বস্তুর অবয়বের দৈশিক সন্নিবেশে যে জাতীয় সামঞ্জস্য উৎপন্ন হয় অন্তর্লোকেও সেই জাতীয় সামঞ্জস্য রচনা করিতে পারে। প্রাকৃতিক জগতে নানা প্রাণীর নানা উদ্ভিদের বিভিন্ন অবয়বের পরস্পর সন্নিবেশে যথাস্থিত সামঞ্জস্যের ছাপ যেমন বিনা চেষ্টাতেই একরূপ আমাদের অজ্ঞাতেই আমাদের অন্তরের

মধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায় তেমনি আমরা সেই দৃষ্ট সামঞ্জস্য অনুসারে আমাদের অন্তরের মধ্য হইতে নূতন নূতন দৈশিক সংস্থান (form) রচনা করিয়া নূতন নূতন সামঞ্জস্য রচনা করিতে পারি। ইহা হইতে ইহা বুঝা যায় যে, যে প্রণালীতে জাগতিক প্রাণী, উদ্ভিদ্, জড়াদির সামঞ্জস্য স্বভাবত উৎপন্ন হইয়াছে আমাদের অন্তরের মধ্যেও সেই একই পদ্ধতিতে এবংবিধ ক্রিয়া চলিতেছে যাহা দ্বারা জাগতিক উপাদান গ্রহণ করিয়া জাগতিক সামঞ্জস্যের অনুরূপ অর্থ ও তদ্বিলক্ষণ সামঞ্জস্য আমরা সৃষ্টি করিতে পারি। আমাদের দেশে নানা আল্পনার চিত্রে ও নানা প্রকারের অলঙ্কার-চিত্র পরিকল্পনায় (decorative design) যে সমস্ত লতাপাতা দেখা যায় প্রাকৃতিক জগতে হয়তো তাহা কোথাও নাই। তথাপি সেগুলিকে লতাপাতা বলিয়া চিনিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। হয়তো বা অনেক স্থলে এমন করিয়া রেখা বিন্যাস হইয়াছে যাহাকে কোনও ক্রমেই লতাপাতা বলা যায় না। কেবল রেখার উপর রেখা ঘুরিয়া ফিরিয়া চলিয়াছে—সেগুলিকে আমরা লতাপাতা বলিতে পারি না অথচ তজ্জাতীয় এমন একটা সামঞ্জস্যের প্রতীতি হয় যাহার মধ্যে লতাপাতা বিন্যাসের সামঞ্জস্যই যেন লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। আমাদের চিত্ত উভয়গত সামঞ্জস্যের পরিচয় পাইয়া এবং চিত্তের মধ্যে প্রকৃতিকে এবং প্রকৃতির মধ্যে চিত্তকে লাভ করিয়া আনন্দ লাভ করে। কোনও সুচিত্রী যখন কোনও বস্তুর যথাস্থিতিক চিত্র আঁকেন তখন সেই বস্তুকে আপন ধ্যানের মধ্যে আহরণ করেন; তখনই তাহা তাহার বহির্রূপতা পরিত্যাগ করিয়া তদনুযায়ী ও তৎসদৃশ অন্তর্রূপে আপনাকে পরিণত করে। এই অন্তরের রূপকে বাহিরের রূপের প্রতীক বলিয়া যে গ্রহণ করা হয়, তাহার মূলেও উপমান প্রক্রিয়া চলিয়াছে। সদৃশ-প্রত্যয়ের বলেই চিত্রী অন্তর্রূপকে বহির্রূপের সদৃশ একটি চৈত্তিক অবস্থা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। এই চৈত্তিক অবস্থাই সৃষ্টির উপযোগী বৈক্ষিক চিত্ত বা aesthetic state.

যখন আমরা একটি বস্তুর সদৃশ বলিয়া অপর একটি বস্তুকে মনে করি তখন কী কারণে আমাদের চিত্তে এই সদৃশ প্রতীতি উৎপন্ন হয়? ইন্দ্রিয় দ্বারা কোনও পুরোবর্তী গোরুকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি এবং সেই গোরুর নানা অবয়বও চক্ষুতে দেখিতে পারি। কিন্তু সেই গোরুর মধ্যে এমন কোনও বিশিষ্টরূপ নাই যাহাকে সদৃশ বলিয়া বলা যায় এবং যাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়গোচর। এইজন্যই ইহা স্বীকার করিতে হয় যে সেই গোরুটি দেখিলে আমাদের অন্তরে অপর গোরুর যে সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় তাহার সহকারিতায় সদৃশ প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। গোরুকে সম্মুখে না দেখিয়া অপর একটি গোরুর কথা মনে ভাবিলেও এই সদৃশ প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। এইজন্য ইহা প্রমাণিত হয় যে সদৃশ প্রত্যয় সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়জ নহে। প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় ব্যবহার না করিলেও দুইটি স্মৃত বস্তুর মধ্যে একটি সাদৃশ্য অনুধাবন করিয়া বর্তমানকালে অনুভব করিতে পারি। অথচ স্মৃতি বা সংস্কার ব্যতিরেকে কেবল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সদৃশ প্রত্যয় উৎপন্ন হয় না। এইজন্যই আমরা আমাদের দেশের দার্শনিক সিদ্ধান্তের প্রতিকূলেও মানিতে বাধ্য হই যে সদৃশ প্রত্যয় সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়জ নহে। যাঁহারা প্রত্যভিজ্ঞা এবং সদৃশ প্রত্যয়কে ইন্দ্রিয়জ বলিয়া মানেন তাঁহাদের তাৎপর্য এই যে স্মৃতি সংস্কারাদি সহকৃত হইলেও বর্তমান দৃশ্যমান বস্তুর একত্ব জ্ঞানের মধ্যেই তাহার পর্যবসান বলিয়া

তাহাকে প্রত্যক্ষ বলা যায়। বেঙ্কট তাঁহার 'ন্যায়পরিশুদ্ধি'-তে প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়ে বলিতেছেন : 'প্রত্যভিজ্ঞা হি নাম অতীত-বর্তমান-কালবর্তি একবস্তুবিষয়কং প্রত্যক্ষজ্ঞানম্। তস্য কালদ্বয়সম্বন্ধবিশিষ্টমেকমেব বস্তু বিষয়ঃ। ন চ তদিত্যংশঃ স্মরণমিদমংশশ্চ গ্রহণম্, অতীতসম্বন্ধিনি ইন্দ্রিয়সম্প্রয়োগাভাবাৎ ইতি বাচ্যং, তদিদমিতি সামানাধিকরণ্যেন গ্রহণস্য একত্বস্ফুরণাৎ।' ('ন্যায়পরিশুদ্ধি', পৃ. ৩১১-১২; ব্রহ্মবাদিন প্রেস, মান্দ্রাজ ১৯১৩।) কিন্তু এই সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধ মতেরও উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন : 'অত্র ধীভেদবাধ্য পরিহারৌ মত্বা তদিদমংশয়োঃ তদংশে সংস্কারান্বয়ব্যতিরেকানুবিধানদর্শনাৎ পরোক্ষরূপতয়া ইদমংশে চ প্রত্যক্ষরূপতয়া চ উভয়াত্মকত্বমাহুঃ।' (৩১২)। তাৎপর্য এই 'ইহাই সেই', এই বোধ স্থলে সেই বোধটি সংস্কার ব্যতিরেকে হয় না, এইজন্য 'ইহাই সেই' এই প্রত্যভিজ্ঞা বোধটি কিয়দংশে পরোক্ষ কিয়দংশে প্রত্যক্ষ। এইজন্য তাহারা প্রত্যভিজ্ঞাকে উভয়াত্মক বলেন। এইজন্য রামানুজ সিদ্ধান্তে প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য জ্ঞান পরোক্ষা-পরোক্ষরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এবং স্মৃতি ও অনুভবের কোনও প্রভেদ উল্লিখিত হয় নাই। ফলে দাঁড়াইতেছে এই যে, প্রত্যভিজ্ঞা সংস্কার-সহকৃত-প্রত্যক্ষজ হইলেও স্মৃতিসমুত্থাপিত দুইটি বস্তুর সাদৃশ্য বা ঐক্য যখন বর্তমানকালে প্রতীত হইতে পারে তখন সদৃশ প্রত্যয়ের প্রতি সংস্কার বা স্মৃতিকেই অব্যভিচারী কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যায়। কিন্তু মূলে প্রত্যক্ষ হইতেই সকল সংস্কারের উৎপত্তি হয়। প্রত্যক্ষের সময় আমরা বস্তু দেখি, তাহার অবয়ব দেখি, অন্যের সহিত তাহার সাহচর্য বা বিরহ দেখি, তাহার নানাবিধ অর্থক্রিয়াকারিত্বের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব দেখি, এবং আমাদের অজ্ঞাতে তাহার বিশেষ বিশেষ ছাপ আমাদের মধ্যে থাকিয়া যায়। এই যে অদৃষ্ট এবং অপ্রতীত ছাপ তাহাকেই সংস্কার বলে। আমরা যখন একটা গোরু দেখি, তখনও তাহারও অবয়বের ছাপ আমাদের অন্তরের মধ্যে থাকিয়া যায়। কিন্তু সাধারণত আমরা অর্থক্রিয়াসক্ত চিত্ত হইয়া গোরুর দ্বারা আমাদের ইষ্টানিষ্টের দিক দিয়া যতটুকু দেখি তাহাতে তাহার অবয়ব সামঞ্জস্যের দিকে আমাদের তেমন দৃষ্টি পড়ে না। কিন্তু একজন চিত্রীর প্রধান আনন্দই সেই অবয়ব সামঞ্জস্যের দিকে। সেইজন্য তিনি যখন গোরুটিকে দেখেন তখন সেই বিশেষ সামঞ্জস্যের দিকেই তাঁহার হৃদয় ও চিত্ত আকৃষ্ট হয়। ফলে তিনি যেরূপ সমগ্র অবয়বের সহিত গোরুর রূপটিকে ধ্যানারূঢ় করিতে পারেন; সেইরূপ অন্তরে তাহার রূপকে প্রত্যক্ষায়মাণ করিতে পারেন অন্যে তাহা পারে না। সেইজন্যই অন্যের পক্ষে গোরুর চিত্র আঁকা সম্ভবপর হয় না। ঘোড়া আঁকিবার সময়ও যে ঘোড়ার সমগ্র অবয়ব অন্তরের ধ্যানের দ্বারা ধারণ না করিয়া তাহা আঁকা সম্ভব নয় সে সম্বন্ধে শুক্রনীতিসারে লিখিত আছে : 'শিল্প্যগ্রে বাজিনং ধ্যাত্বা কুর্য্যাদবয়বানতঃ।' ('শুক্রনীতিসার', ৫২৪ পৃ.)। কোনও দর্শক যখন সেই চিত্র দেখেন তখন অস্ফুট ভাবে তাঁহার চিত্তে গোপিণ্ডের যে সাদৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছিল চিত্রীর চিত্তে তদনুরূপ রেখাসম্পাত দেখিয়া সেই চিত্রকে গোরুর চিত্র বলিয়া চিনিতে পারেন। গোরু দেখিবার সময় যেমন কোনও বিশিষ্ট গোরুর বিশিষ্ট ধর্মগুলি আমাদের সংস্কার ভূমিতে আরূঢ় হয় তেমনি সমস্ত বিশেষ ধর্মনিরপেক্ষ কেবল গো-ব্যক্তির অবয়বের প্রকার ও অবয়বের সহিত অবয়বের

সন্নিবেশবিশিষ্টতাও সংস্কারারূঢ় হইয়া থাকে। ইহা গোবিশেষের সংস্কার নহে ইহা গো-সামান্যের সংস্কার। অথচ এই সংস্কার উৎপন্ন হইবার সময় কোনও জ্ঞানপূর্বক সামান্যবোধ থাকে না। আমাদের চিত্তেরই এমন একটি বিশেষ ধর্ম আছে যাহা দ্বারা বিশেষকে বর্জন করিয়া যে সামান্য রূপের মধ্যে সেই বিশেষ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে। চিত্রীর চিত্তে কেবলমাত্র যে অবয়বের সন্নিবেশ-বৈচিত্র্যই অঙ্কিত হয় তাহা নহে। সেই অবয়ব সন্নিবেশের দ্বারা সেই অবয়বটির বিভিন্ন অবয়বে যে বিশেষ ভঙ্গিগুলি ফুটিয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে পরস্পরের যে একটি অনুরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাও তাহার মনের মধ্যে অস্ফুট ভাবে গ্রথিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন অবয়ব সন্নিবেশের বিভিন্ন ভঙ্গিগুলির মধ্যে যে একটি বিশেষ জাতীয় অনুরূপ সম্বন্ধ আমরা প্রকৃতিতে দেখিয়া থাকি তাহাকেই বলে সামঞ্জস্য। কিন্তু একটি কথা এখানে মনে রাখা উচিত, যে, এই যে অবয়ব ভঙ্গিগুলির মধ্যে বিশেষ একটি অনুরূপ সম্বন্ধই আমাদের চিত্ত গ্রহণ করিতে যায় তাহার কারণ কী? যে অবয়ব সন্নিবেশগুলির ভঙ্গি কোনও একটি বিশেষভাবে গ্রহণ করিলে অনুরূপ হয় তাহারাই হয়তো অন্যবিধ বিকৃত ভাবে বিলোম প্রণালীতে গৃহীত হইলে অসমঞ্জস বলিয়া মনে হইতে পারে। যে ভঙ্গিগুলি গো-শরীরের সমুদায়ের সহিত কোনও একটি বিশেষ প্রণালীতে গৃহীত হইলে অনুরূপ ভঙ্গি বলিয়া মনে হইবে তাহাই অন্য প্রণালীতে গৃহীত হইলে বিলোম ও অসমঞ্জস বলিয়া মনে হইবে। গোশরীরের ভঙ্গিগুলির সহিত তুলনা করিলে মনুষ্যশরীরের ভঙ্গিগুলির সম্বন্ধ প্রতিকূল মনে হইতে পারে। অথচ অন্য এক পদ্ধতিতে দেখিলে গো-শরীরের ভঙ্গিগুলির মধ্যে গো-শরীরের অনুপাতে যে অনুরূপ সম্বন্ধ আছে মনুষ্যশরীরের ভঙ্গিগুলির মধ্যেও মনুষ্যশরীরের অনুপাতে সেই একই প্রকারের অনুরূপ সম্বন্ধ আছে। তবেই ইহা মানিতে হয় যে আমাদের চিত্ত, বিশেষত চিত্রীর চিত্ত, এমন একটি বিশেষ প্রণালীতে ব্যাপারবান হয় যাহা দ্বারা অনন্ত সম্বন্ধ-পরম্পরার মধ্য হইতে একটি বিশিষ্ট জাতীয় সম্বন্ধ-পরম্পরা সে বাছিয়া লয়। যে বিশিষ্ট জাতীয় সম্বন্ধ-পরম্পরার মধ্য দিয়া আমাদের চিত্ত তাহার সহজ গতিকে অব্যাহত রাখিয়া চলিতে পারে এবং গতি-পরম্পরার মধ্যে আপন ধর্মকে আপনার বলিয়া চিনিয়া লইতে পারে; সেই বিশিষ্ট পদ্ধতিতে চিত্ত বহির্জগৎ হইতে সম্বন্ধ-পরম্পরা আহরণ করে। একদিকে যেমন বলিতে হয় যে একটি গোব্যক্তির মধ্যে তাহার ভঙ্গিগুলির একটি অনুরূপ সম্বন্ধ আছে এবং সেই সম্বন্ধ বা সমঞ্জস্যটি গোব্যক্তিরই স্বাভাবিক ধর্ম। অপর দিক দিয়া দেখিতে গেলে তেমনি বলিতে হয় যে সেই অনুরূপতা বা সামঞ্জস্যটি চিত্তেরই আপন স্বাভাবিক ধর্ম। অর্থাৎ যে সম্বন্ধ পরম্পরার মধ্য দিয়া চিত্ত আপনাকে সমগ্রের সহিত খণ্ডকে মিলাইয়া লইতে পারে (এবং সেই আত্মপরিচয়ের ব্যাপারে কোনও ব্যাঘাত বা প্রতিবাদ অনুভব করে না) তাহাই অনুরূপতা বোধ বা সামঞ্জস্য বোধ। সদৃশ প্রত্যয় স্থলেও এই রকমই একটি ভঙ্গির সহিত বা কতকগুলি ভঙ্গি সমষ্টির সহিত অপর একটি ভঙ্গির বা ভঙ্গিসমষ্টির অনুরূপতা বা সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। এ স্থলেও ইহাকে চিত্তের স্বান্তর্ব্যাপারবর্তী স্বানুকূল সম্বন্ধ

ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। চিত্ত যখন একটি ভঙ্গি সমষ্টির মধ্য দিয়া আর একটি ভঙ্গি সমষ্টির মধ্যে অনায়াসে ব্যাপারবান হইয়া উঠিতে পারে এবং তাহার মধ্য দিয়া আপন ব্যাপারের অনুকূল পরিচয় লাভ করিতে পারে তখন তাহার ফলে যে প্রতীতি হয় তাহাকেই সদৃশ প্রতীতি বলা হয়। বস্তুত সদৃশ প্রতীতি ও সামঞ্জস্য বিভিন্ন জাতীয় দুইটি বিভিন্ন প্রকারের প্রতীতি। কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধতার মধ্যে যখন সাদৃশ্যানুভূতি ঘটে তখনই তাহার ফলে আর একটি বিশিষ্ট জাতীয় প্রত্যয় জন্মে, তাহাকে সামঞ্জস্য প্রতীতি বলা হয়। আর দুইটি বস্তুর সদৃশতাকে অবলম্বন করিয়াই যখন প্রতীতি উৎপন্ন হয় তখন সদৃশপ্রত্যয় বলা হয়। সাদৃশ্য বলিতে আমরা প্রধানত সদৃশের ধর্ম বুঝি কিন্তু নৈয়ায়িক পরিভাষায় সাদৃশ্য বলিতে বুঝা যায় সদৃশপ্রত্যয়োৎপত্তিহেতু। এই সদৃশপ্রত্যয়োৎপত্তিহেতু, প্রত্যক্ষ স্থলে একদিকে বর্তমান বস্তু কিংবা তাহার অবয়বের বিভিন্ন অংশ এবং অপরদিকে অনুস্যূত অন্য বস্তু বা পুরোবর্তি বস্তুরই অনাবৃত দুইটি অংশ। বহির্বস্তুর দ্বারা যে রূপ গৃহীত হইয়াছে সেই রূপের সহিত অনুস্যূত বস্তুটির যে চিত্র মনে উঠিয়াছে এই উভয়ের মধ্যে আমাদের চিত্ত যদি তাহাকে একই লীলায় ব্যাপারবান করিয়া তোলে এবং দুইটি যদি পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়া না দাঁড়ায় তাহা হইলে অন্তরের মধ্যে যে ঐক্যচ্ছন্দ প্রতীত হয় তাহাকেই সদৃশপ্রত্যয় বলা হয়। সামঞ্জস্য স্থলেও এই একরকমরেই চিত্তবৃত্তি হইয়া থাকে। চিত্তব্যাপারের একটি লীলা আছে, যাহাতে তাহা লতার ন্যায় লীলায়িত হইয়া বহুর মধ্য দিয়াও আপনার ঐক্যের পরিচয় পাইয়া আপনার মধ্যে আপনাকে লাভ করিয়া চলিতে থাকে যেখানে বহুত্বের দ্বন্দ্ব জাগ্রত হইয়া উঠে না, সেখানে দ্বন্দ্বের অংশ অপ্রধান এবং ঐক্যের অংশ প্রধান। চিত্তের আর একটি ব্যাপার আছে যেখানে দ্বন্দ্বের অংশ প্রধান হয় এবং তাহার ফলে চিত্তশক্তির নবোদ্বোধ হইয়া চিত্ত সেই দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করিয়া দ্বন্দ্বায়মান দুইকে একটি নূতন তাৎপর্যের মধ্যে এক করিয়া সেই একের মধ্যে নিজের সাম্যলাভ করে এবং পুনরায় দ্বন্দ্বসৃষ্টি করিয়া দ্বন্দ্বায়মান দুইকে পরে একটি ঐক্যের ভূমিতে লইয়া যায়। Hegel চিত্তের এই দ্বন্দ্বায়মান ব্যাপারকেই ইহার সার্বভৌম ব্যাপার বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। ইহা সত্য যে এই ব্যাপার হইতে গেলেই একটি স্বেতরত্ব বা অন্যত্ব থাকা আবশ্যক — গতিমাত্রই দুই ছাড়া হয় না। কিন্তু স্বেতরত্ব বা স্বান্যত্ব হইলেই দ্বন্দ্ব হয় না। এই প্রসঙ্গটি *What is living and what is dead of Hegel* এই গ্রন্থে Croce বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে আমার যা বক্তব্য তাহা আমি গ্রন্থান্তরে বলিব। এখানে আমি শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে চিত্তের এই যে সাবলীল গতি যাহাতে অন্যত্ব প্রায় তিরোহিত হইয়া যায় এবং এতাদৃশ অন্যত্বের মধ্য দিয়া, চিত্ত, আপন গতির মধ্যে এবং অন্যত্বের, মধ্যে আপন একত্বেরই পরিচয় পায় সেইখানেই সাদৃশ্যবোধ বা সামঞ্জস্যবোধ বা পরিচয়বোধ উৎপন্ন হয়। একদিকে চিত্ত আপন সাবলীল প্রণালীতে বহির্বস্তুর একটি বিশেষ বিশেষ সামঞ্জস্য বা দ্বন্দ্ব আপনার মধ্যে গ্রহণ করে। এই গ্রহণের মধ্যে চিত্তের একটি বাছিয়া লইবার ক্ষমতা বা selective power-এর পরিচয় পাওয়া যায়। যে সামঞ্জস্যটি চিত্ত বহির্বস্তুর মধ্যে আবিষ্কার করে তাহা বস্তুধর্ম হইলেও চিত্তধর্ম। বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্যের অনুরূপ কি আছে আমরা

জানি না, কিন্তু চিত্তের মধ্যে তাহার যে রূপ প্রকাশ পায় তাহাকে আমরা সামঞ্জস্য বলি, কাজেই বস্তুকে অবলম্বন করিয়া ইহা একপ্রকার চিত্তেরই সৃষ্টি। যখন আমাদের চিত্ত অর্থক্রিয়াকারিত্বের তাড়নায় প্রয়োজনের দিক দিয়া বস্তুকে আলোচনা করে তখনও ইহার কাজ আমাদের জ্ঞাতমনের বাহিরে সংস্কারভূমিতে চলিতে থাকে। কোনওরূপ উদ্বোধক চৈত্তিক বা বাহ্যিক সামগ্রী উপস্থিত হইলে ইহা উদ্বুদ্ধ হয়। এই সামঞ্জস্যের কোনও বিশিষ্ট সমগ্র রূপ যখন জ্ঞাতচিত্তের মধ্যে ভাসিয়া উঠিয়া স্থির হইয়া বিধৃত হয়, তখনই একটি ধ্যানসৃষ্টি ঘটে। এই ধ্যানসৃষ্টিকে কোনও কোনও ইয়োরোপীয়েরা intuition বলিয়াছেন। আমাদের দেশে কেবল দেবদেবীর সৃষ্টির বেলায় নয়, প্রাণী বা মনুষ্যসৃষ্টির বেলায়ও সমাধিসৃষ্টির বা ধ্যানসৃষ্টির কথাও উল্লিখিত আছে। এই ধ্যানসৃষ্টির পর বাহ্যরূপসৃষ্টি। এই প্রক্রিয়া গ্রহণপ্রক্রিয়ার বিপরীত ক্রিয়ামাত্র। যে প্রক্রিয়ার বাহিরের সামঞ্জস্য অন্তরের মধ্যে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতরূপে অঙ্কিত হইয়াছে, ধ্যান-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়া তাহাই কিঞ্চিৎ স্ফুট হইয়া আবার তাদৃশ বাহ্যরূপের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ করে। ধ্যানের মধ্যে সংস্কার হইতে সামগ্রী আহৃত হইয়া একটি রূপ ফুটিয়া উঠিলেও, সংস্কারের সমস্ত অনুরূপ সামগ্রী তাহার মধ্যে নিঃশেষে স্ফুট হয় না। ধ্যানধৃত রূপ যেমন বাহিরের রেখায় রেখায় ফুটিতে থাকে তেমনি সে রেখার উদ্বোধকতায় সংস্কারচিত্ত অনেক সময় ধ্যানাবস্থাকে অতিক্রম করিয়া চিত্রকরের নিকট নব নব ব্যঞ্জনা উপস্থাপিত করে। অনেক সময়ে এই নব ব্যঞ্জনা ধ্যানধৃতের অনুরূপ হইলেও অতিরিক্ত। এইটুকুকে বিশেষ ভাবে শিল্পীর intuition বা চৈত্রিক প্রজ্ঞা বলা যাইতে পারে। ইহা যে কেমন করিয়া উদিত হইল তাহাও ব্যাখ্যা করা সহজ নহে, কারণ সংস্কারাবস্থার সাক্ষাৎ উদ্বোধকতায় ইহার উৎপত্তি। এই উৎপত্তির সময়ে ইহা অনেক সময়ে জ্ঞাতচিত্তের ধ্যানধৃতরূপকে অতিক্রম করিয়া যায়। কাজেই জ্ঞাতচিত্তের মধ্যে অন্বেষণ করিয়া ইহার পদ্ধতি, প্রণালী বা প্রেরকতার স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। চিত্ত যেমন ফুটিয়া উঠিতে থাকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্বীক্ষা-মূলক চিত্তবৃত্তি যাহার দ্বারা আমরা ভ্রানত যুক্তিত বিচার করি তাহাও অলস হইয়া থাকে না। তাহাও জাগ্রত হইয়া উঠিয়া ম্রিয়মাণ সৃষ্টির দোষ, গুণ, সামঞ্জস্য, অসামঞ্জস্য প্রভৃতির সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে থাকে। সেই মতামতের সহযোগিতায় সংস্কারীয় অভিব্যঞ্জনা ও ধ্যানধৃতরূপের আত্মপ্রকাশের চেষ্টা সংযন্ত্রিত ও পরিবর্ধিত হইতে থাকে। আমাদের হাতের ক্রিয়াকুশলতার সহিত সংস্কারের অভিব্যঞ্জকতা ও ধ্যানধৃতরূপের আত্মপ্রকাশের চেষ্টার সম্পূর্ণ একতানতা অত্যন্ত দুর্লভ। এইজন্যই সংস্কারের অভিব্যঞ্জকতাকে আমাদের হাত সব সময় প্রকাশ করিতে পারে না, আমাদের ভাষা সব সময়ে আমাদের মনের ঠিক বিশেষ ভাবটুকু ফুটাইয়া তুলিতে পারে না। হাত ও অন্তর্মনের সহিত এই যে একতার অভাব এবং তৎপ্রযুক্ত যে সমস্ত দোষ উৎপন্ন হয় তাহাকেই সংশোধন করিতে চেষ্টা করে অন্বীক্ষাবৃত্তিমূলক জ্ঞাতমনোবৃত্তির বিচারপদ্ধতি। এই বিচারপদ্ধতি আপন সৃষ্টির দোষ দেখাইয়া চিত্তের সংস্কারানুযায়িভাবে হাতকে নিয়ন্ত্রিত করাইবার চেষ্টা করে। এইজন্য চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতিতে

প্রথম চাই যথাবৎ পর্যবেক্ষণ। তাই ‘শুক্রনীতিসার’-এ লিখিত আছে—

‘যদ্‌রূপংকর্তুমুদ্‌যুক্ত স্তদ্বিম্বং বীক্ষ্য সর্বতঃ
অদৃষ্টং যস্য যদ্‌রূপং ন কর্তুং ক্ষমতে হি তৎ।’ (পৃ. ৫২৪)

অর্থাৎ যাহার যে রূপ তাহা চিত্রী প্রথমত যত্নের সহিত পর্যবেক্ষণ করিবে। সমরাঙ্গণসূত্রধারে ২৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যে শিল্পী বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিলে এবং কার্যদক্ষ না হইলে শিল্পকার্য সুসম্পন্ন করিতে পারে না।

‘শাস্ত্রং কর্ম তথা প্রজ্ঞা শীলং চ ক্রিয়য়ান্বিতম্
লক্ষ্যলক্ষণযুক্তার্থশাস্ত্রনিষ্ঠো নরোভবেৎ।
সামুদ্রং গণিতঞ্চৈব জ্যোতিষং ছন্দ এব চ
শিরাজ্ঞানং তথা শিল্পং যন্ত্রকর্মবিধিস্তথা।’

অর্থাৎ যিনি চিত্রী বা শিল্পী হইবেন, তাঁহার যেমন শাস্ত্রজ্ঞান থাকা আবশ্যক তেমনি কর্মে দাক্ষ্য থাকা প্রয়োজন, তেমনি প্রজ্ঞা বা intuition থাকা প্রয়োজন এবং চরিত্রসম্পদে ও বহুদর্শিতায় ও বহুক্রিয়াকরণে অভ্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। চিত্রাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাঁহাকে অভিজ্ঞ হইতে হইবে। স্থপতি বা শিল্পীকে সামুদ্রশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, ছন্দ এবং মনুষ্যাদি শরীরের শিরা, পেশি, স্নায়ু প্রভৃতির অবস্থান ও পরিমাণ আদি সম্বন্ধে বিচক্ষণ হইতে হইবে। কেবল শাস্ত্র জানিয়া শিল্পী হইতে গেলে ভীরু যেমন রণশাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও যুদ্ধ দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে, সেইরূপ শিল্পীও স্বকার্যে অসমর্থ হয়।

‘যস্তু কেবলশাস্ত্রজ্ঞঃ কর্মস্বপরিনিষ্ঠিতঃ
স মুহ্যতি ক্রিয়াকালে দৃষ্ট্বাভীরুরিবাহবম্।’

তেমনি যে ব্যক্তি কেবল হাতের কার্য করিয়াছে অথচ শাস্ত্রজ্ঞান আহরণ করে নাই, সেও অন্ধের ন্যায় একপথে যাইতে অন্যপথে গিয়া উপস্থিত হয়।

‘কেবলং কর্ম যোবেত্তি শাস্ত্রার্থং নাধিগচ্ছতি
সোঽচক্ষুরিব নীয়েত বিবশোঽন্যেন বর্ত্মসু।’

শাস্ত্রজ্ঞান এবং অভ্যাস থাকিলেও যদি প্রজ্ঞা বা intuition না থাকে তবে শিল্পীর শিল্প মদহীন হস্তীর ন্যায় নিবীর্য হয়।

‘শাস্ত্রকর্মসমর্থোঽপি স্থপতিপ্রজ্ঞয়া বিনা
ন ফলেৎ কর্মভিঃশিল্পী স্যান্নির্মদইবদ্বিপঃ।’

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও প্রজ্ঞা দ্বারাই শিল্পকার্যের নিগূঢ় তত্ত্বকে প্রকাশ করা যায়। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও প্রজ্ঞা এই উভয়ের তুলনা করিলে প্রত্যুৎপন্নমতিকেই বাহ্য সম্পদ বলা যায় এবং প্রজ্ঞাই অন্তশ্চক্ষু হইয়া দূরালোক এবং মূঢ়ার্থকে প্রকাশ করিয়া থাকে—

‘প্রত্যুৎপন্নমতির্যস্মাৎ বাহ্যতঃ স্থপতিস্তথা
কর্মকালে ন মূহ্যেৎ স প্রজ্ঞানেনোপবৃংহিতঃ
অপ্রজ্ঞেয়ং দূরালোকং গূঢ়ার্থং বহুবিস্তরম্।

প্রস্তোপেতং সমারুহ্য প্রাজ্ঞোবস্তুমুপাচরেৎ। পৃ. ২৩৬

কিন্তু এই সমস্ত গুণ থাকা সত্ত্বেও শিল্পী যদি সংযতচিত্ত ও সংযতচরিত্র না হয় তাহা হইলে রাগদ্বেষাদিপ্রযুক্ত তাহার পক্ষে চিত্রের বস্তুর ধ্যান সম্ভব নহে। নিরন্তর চিত্তবিক্ষেপের কারণ থাকা প্রযুক্ত, এতাদৃশ শিল্পী চিত্রেয় বস্তু সম্বন্ধে স্থিরভাবে ধ্যানসমাপন্ন হইতে পারেন না।

'জ্ঞানবাংশ্চ তথা বাগ্মী কর্মসুপরিনিষ্ঠিতঃ
এবং যুক্তোঽপি ন শ্রেয়ান্ যদি শীলবিবর্জিতঃ।
রোষাদ্ দ্বেষাৎ তথা লোভান্ মোহাদ্রাগাৎ তথৈবচ
অন্যচিত্তত্বমায়াতি দৌঃশীলস্যাপরিক্ষয়াৎ
শীলবান্ পূজিতো লোকে শীলবান্ সাধুসম্মতঃ
শীলবান্ সর্বকর্মার্হঃ শীলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
শীলাধানে পরং যত্নমাতিষ্ঠেৎ স্থপতিঃ সদা
ততঃ কর্মাণি সিধ্যন্তি জনয়ন্তি শুভানি চ।' পৃ. ২৩৬

সাধারণত অনেকের বিশ্বাস যে আমাদের দেশে শিল্পীদের কোনও শারীরজ্ঞান বা anatomical knowledge থাকিত না এবং এই জ্ঞান অর্জন করাও তাহারা আবশ্যক মনে করিতেন না। এই ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক তাহা পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকে প্রমাণিত হয়; কারণ ওই শ্লোকে শিরাশাস্ত্র শিল্পীদিগের একটি বিশেষ অধ্যেতব্য শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত পূর্বোদ্ধৃত শ্লোকগুলি মিলাইলে আমাদের দেশের শিল্পপদ্ধতি সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা সহজেই উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ আশা করা যায়। শিল্পী প্রথমত তাহার বিশেষ প্রতিভার দৃষ্টিতে জগতের যাবতীয় বস্তুকে তাহাদের যথাস্থিত অবস্থায় দেখিতে অভ্যস্ত হইবেন এবং শিল্পশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, স্থপতিশাস্ত্র প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবেন। আত্মসংযমের দ্বারায় চিত্তকে ধ্যেয় বস্তুতে সমাধিসমাপন্নভাবে চিত্তের সম্মুখে স্থির ও দৃঢ় করিয়া রাখিতে শিখিবেন। চিত্তসংযম না থাকিলে ইহা সম্ভব নহে। যাঁহাদের চিত্ত সর্বদা রাগদ্বেষ-সংশ্লিষ্ট তাঁহারা চিত্রের বস্তুকে ধ্যানের দ্বারা দীর্ঘকাল দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিতে পারেন না এবং সেইজন্য তাঁহারা উৎকৃষ্ট শিল্পী হইতে পারেন না। কিন্তু এই সমস্ত গুণ থাকিলেও যদি প্রজ্ঞা না থাকে তবে বিবিধ ভাব ও রসাদির যথার্থ সন্নিবেশ করিয়া শিল্পী তাঁহার চিত্রকে প্রকাশসম্পন্ন ও বীর্যবৎ করিয়া তুলিতে পারেন না। চিত্রের মধ্যে চিত্রেয় বস্তুর নানা নিগূঢ় তাৎপর্য ফুটাইয়া তুলিতে হইলেও চৈত্রিকপ্রজ্ঞা একান্ত আবশ্যক। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বকে এই প্রজ্ঞা হইতে শাস্ত্রকারেরা পৃথক বলিয়া অনালোচিত ও অচিন্তিত কোনও সমস্যার উদয় হইলে তাহা হইতে নিজেকে নির্মুক্ত করিয়া চিত্রী আপনার প্রতিবন্ধক দূর করিতে পারেন।

প্রসঙ্গান্তরে কাব্যশিল্প সম্বন্ধে বলিতে গিয়া কাব্যমীমাংসায় রাজশেখর কয়েকটি কথা বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন যে বুদ্ধি দুই প্রকার, স্বাভাবিক ও আহার্য। আহার্যবুদ্ধি আবার তিন প্রকার, স্মৃতি, মতি ও প্রজ্ঞা। অতিক্রান্ত বিষয়ের

স্মরণাত্মিকা বুদ্ধি, স্মৃতি, বর্তমান কালের মননকে বলে মতি আর অনাগতকে যাহা জানায় তাহাকে বলে প্রজ্ঞা (অনাগতস্য প্রজ্ঞাতৃ প্রজ্ঞেতি)। অহরহ সদ্‌গুরুর উপাসনাদ্বারা বুদ্ধি ক্রমশ উৎকর্ষ লাভ করে। সদ্‌গুরুর উপাসনাই বুদ্ধিবিকাশের কামধেনু। এই বৃত্তিগুলির ক্রিয়াসম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে প্রজ্ঞাজ্যোতির দ্বারা প্রথমত যথার্থ বস্তুকে গ্রহণ করা যায়। তাহার পর ঊহাপোহের (judgment) দ্বারা সেই সম্বন্ধে আমাদের মন সজাগ হইয়া উঠে। তাহার পর সেই বিষয়ে পুনঃপুন অভিনিবেশের দ্বারা তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রচনা করা যায়। বিদ্যাবৃদ্ধদের সহিত সংলাপের দ্বারা এতাদৃশ রচনাকে অমৃততুল্য করা যায় :

'প্রথয়তি পুরঃ প্রজ্ঞাজ্যোতির্যথার্থপরিগ্রহে
তদনু জনয়ত্যূহাপোহক্রিয়াবিশদং মনঃ।
অভিনিবিশতে তস্মাত্তত্ত্বং তদেকমুখোদয়ং
সহ পরিচয়ো বিদ্যাবৃদ্ধৈঃ ক্রমাদমৃতায়তে॥' (পৃ. ১১)

ইনি শ্যামদেবের মত উদ্ধৃত করিয়া আরও বলিয়াছেন যে কাব্যকর্মে কবির সমাধি বিশেষভাবে ব্যাপারবান হইয়া উঠে। মনের একাগ্রতাকেই বলে সমাধি এবং সমাহিতচিত্তই যথার্থবস্তু সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে : 'কাব্যকর্মণি কবেঃ সমাধিঃ পরং ব্যাপ্রিয়তে ইতি শ্যামদেবঃ মনস একাগ্রতা সমাধিঃ সমাহিতং চিত্তম্ অর্থান্, পশ্যতি।' একটি প্রাচীন শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি আরও বলিতেছেন যে সাধারণত সৎবস্তুর জানাতেই চিত্তের কার্য পরিসমাপ্ত হয়। কেবলমাত্র সমাধিই সারস্বত মহারহস্যকে উদ্‌ঘাটন করিতে পারে :

'সারস্বতং কিমপি তৎ সুমহারহস্যম্
যদ্‌গোচরে য বিদুষাং নিপুণৈকসেব্যম্।
তৎ সিদ্ধয়ে পরময়ং পরমোঽভ্যুপায়ো
যচ্চেতসো বিদিতবেদ্যবিধেঃ সমাধিঃ॥' (পৃ. ১২)

মঙ্গলের মত উদ্ধৃত করিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন যে সমাধি যেমন আন্তর প্রযত্ন, তেমনি অভ্যাস বাহ্য প্রযত্ন, এই উভয়শক্তির দ্বারা কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে। এতদতিরিক্ত আর একটি শক্তি আছে যহাকে বলা যায় প্রতিভা। প্রতিভা না থাকিলে প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্তুও অপ্রতক্ষ্যের ন্যায় হয়, আর প্রতিভা থাকিলে অদৃষ্ট বস্তুও প্রত্যক্ষের ন্যায় হয়। কাব্যমীমাংসার মতে প্রতিভা দুই রকম, কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী। যে প্রতিভা শিল্পকার্যসাধনের অনুকূল হয় তাহাকে বলা যায় কারয়িত্রী। এই কারয়িত্রী প্রতিভা আবার তিনরকম, একটি স্বাভাবিক বা সহজ। ইহার একটি জন্মান্তরের সংস্কারের দ্বারা উৎপন্ন হয়, আর একটি ইহজন্মের সংস্কারের দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহাকে বলা যায় আহার্য, আর একটি তৃতীয়স্তরের প্রতিভাকে বলা যায় ঔপদেশিকী। সহজ প্রতিভায় অল্পমাত্র ইহজন্মের সংস্কারের দ্বারাই কার্য নিষ্পন্ন হয়, আর আহার্য প্রতিভায় অধিক পরিমাণে ইহজন্মের সংস্কারের প্রয়োজন হয়। এই ত্রিবিধ প্রতিভাসম্পন্ন কবিকে যথাক্রমে সারস্বত, আভ্যাসিক ও ঔপদেশিক বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকারের ভাবয়িত্রী প্রতিভার দ্বারা কবির অভিপ্রায়

উদ্ভাসিত হয়। এই জাতীয় প্রতিভাসম্পন্ন লোক না থাকিলে কবির কাব্যতরু নিষ্ফল হয়। অনেক লোক আছে যাহাদের রুচি নাই, তাহারা কাব্যরস গ্রহণ করিতে পারে না। এতাদৃশ বুদ্ধিকে অরোচকিতা বলে। কেহ কেহ বা কোনও জাতীয় জ্ঞানেই এতাদৃশ অনুরক্ত যে কাব্যরস আস্বাদন করিতে পারে না। কেহ কেহ বা মৎসরিতাপ্রযুক্ত রস গ্রহণ করার সামর্থ থাকিলেও করিতে পারে না। কেহ কেহ বা কাব্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিতে পারে, অপর বহু অংশ গ্রহণ করিতে পারে না, কাব্যের যথার্থ গুণদোষাদিও বুঝিতে পারে না। যতটুকু বুঝিতে পারে সেই অনুসারে রস পায়, হয়তো শেষ পর্যন্ত বুঝাইয়া দিলে সবটুকুও বুঝিতে পারে। এতাদৃশ বুদ্ধিকে বলে 'সতৃণাভ্যবহারিতা'। কিন্তু যাঁহার বুদ্ধি 'তত্ত্বাভিনিবেশিনী', তিনি একদিকে যেমন শাস্ত্রগ্রন্থন কৌশলে আনন্দ পান অপরদিকে তেমনি বাক্যের স্ফুটতা ও অর্থগৌরব দেখিয়া মুগ্ধ হন ও সমস্ত তাৎপর্য বুঝিয়া রসে অভিষিক্ত হন।

'শব্দানাং বিবিনক্তি গুম্ফনবিধীনামোদতে সূক্তিভিঃ
সান্দ্রং লেঢ়ি রসামৃতং বিচিনুতে তাৎপর্যমুদ্রাঞ্চয়ঃ।
পুণ্যৈঃ সংঘটতে বিবেক্তৃবিরহাৎ অন্তর্মুখং তাম্যতাম্
কেষামেব কদাচিদেব সুধিয়াং কাব্যশ্রমজ্ঞোজনঃ।

('কাব্যমীমাংসা', পৃ.১৪-১৫)

কাব্যমীমাংসার বাক্যগুলি স্মরণ রাখিয়া আমদের পূর্ব প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করিলে আমরা চিত্রপদ্ধতির মধ্যে আরও একটু বিশেষভাবে প্রবিষ্ট হইতে পারি। চিত্রী একদিকে বাহ্যবস্তুর সহিত পরিচয় রাখিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ শাস্ত্র লোকাচার জীবজন্তু প্রভৃতির নানাপ্রকার ব্যবহার সম্বন্ধেও অভিজ্ঞ হইবেন অপরদিকে তেমনি তাঁহার চিত্ত এমন হওয়া চাই যাহাতে কোনও বস্তুবিশেষ দেখিয়া তাহার নানা সামঞ্জস্য সম্বন্ধ জাগ্রত হইয়া উঠে। চিত্রী রোষদ্বেষমোহাদির আধিক্য হইতে বর্জিত হইবেন এবং দৃশ্যমান বা ধ্যায়মান বস্তুর আনন্দে তাঁহার চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিবে। সেই আনন্দে তিনি ধ্যানের দ্বারা চিত্রের বস্তুকে হৃদয় মধ্যে বিধারণ করিবেন। কারয়িত্রী প্রতিভা দ্বারা তাঁহাকে রেখাবর্ণনাদিদ্বারা চিত্রপটে সন্নিবেশ করিতে একটু স্বাভাবিক পটুত্ব থাকিবে। এই স্বাভাবিক পটুত্বকে অভ্যাস ও গুরূপদেশের দ্বারা তিনি সংকৃত করিবেন। চিত্তের নিয়োগানুসারে হাতকে যথাযথভাবে চালাইতে হইলে প্রতিভা ও অভ্যাস সহায়ক হয়। ইয়োরোপীয় সৌন্দর্যতত্ত্ববিৎ ক্রোচে বলিয়াছেন যে চিত্রীর মনে যে ধ্যানরূপে চিত্রেয় বস্তু বিধৃত হয় তাহারই মধ্যে যুগপৎ সেই চিত্রেয় বস্তুর প্রকাশযোগ্য রেখাও বর্ণাবলীও তৎসহিতই একই কালে চিত্তের মধ্যে উপনীত হয়। এই মত পোষণ করেন বলিয়া চিত্র আঁকিবার যে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন, মনের রূপকে বাহিরের রূপ দিবার যে বিশেষ কৌশল ও অভ্যাসনিষ্পন্ন দাক্ষ্যের প্রয়োজন সে বিষয়ে তিনি একপ্রকার কিছুই বলেন নাই। কাব্য প্রসঙ্গে বলিতে গিয়া জগন্নাথ পণ্ডিত প্রতিভার লক্ষণ দিয়াছেন : 'কাব্যঘটনানুকূল-শব্দার্থোপস্থিতিঃ'। তিনি আরও বলেন, এই প্রতিভার কোনও স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। ইহা একটি অখণ্ড জাতিবিশেষ বা উপাধিস্বরূপ (unanalysable character) 'অপ্রতিভাত্বং কাব্যকারণতাবচ্ছেদকতয়া সিদ্ধো জাতিবিশেষ উপাধিস্বরূপং বাখণ্ডম্' কিন্তু রাজশেখর বলেন

যে সমাধি ও অভ্যাস এই উভয় হইতে যে শক্তি উদ্ভাসিত হয় তাহা হইতে প্রতিভার সৃষ্টি হয়। প্রতিভার লক্ষণ দিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন : 'যা শব্দগ্রামমমর্থসার্থমলঙ্কারতন্ত্রযুক্তি-মার্গমন্যদপি তথাবিধমধিহৃদয়ং প্রতিভাসয়তি সা প্রতিভা।' তাৎপর্য এই যে সমাধি যখন অভ্যাসের সহিত যুক্ত হয় যখন তাহাদ্বারা যে শক্তি উৎপন্ন হয় তাহাদ্বারা কাব্যোচিত সমস্ত শব্দাদি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এই রীতি প্রয়োগ করিতে গেলে বলিতে হয় যে এই শক্তি দ্বারা চিত্রী তাঁহার হাতে যথাযথ রেখা বর্ণাদি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন। প্রতিভার এই লক্ষণ অনুসারে প্রতিভা দ্বারা সেই শক্তিটুকু বুঝা যায় যাহাদ্বারা ধ্যানধৃতরূপকে বাহিরের রেখা রূপাদি দ্বারা প্রকাশ করা যায়। কিন্তু ধ্যানধৃত রূপটি কোথা হইতে আসে? রাজশেখরের মতানুসারে স্মৃতি ও প্রজ্ঞাই ইহার মূল। স্মৃতি দ্বারা পূর্বদৃষ্ট বস্তুর যথাসম্ভব যথাযথ জ্ঞান হয়। কিন্তু কেবল যথাযথ বস্তুর ভান হইলেই শিল্প হয় না। শিল্পের মধ্যে এমন একটি দৃষ্টি চাই যাহাদ্বারা পূর্বে যাহা গৃহীত হয় নাই এমন নূতন নূতন সম্বন্ধ-পরম্পরা এবং সামঞ্জস্য প্রতিভাত হয়। এই দৃষ্টি কোথা হইতে আসে? কেমন করিয়া আসে? তাহার কোনও বিশেষ কারণ নির্দেশ শাস্ত্রকারেরা করেন নাই। কিন্তু কাব্যমীমাংসায় ও অন্যান্য শিল্পশাস্ত্রে এই দৃষ্টিটি প্রজ্ঞা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রাজশেখর বলিয়াছেন : 'অজ্ঞাতস্য প্রজ্ঞাত্রী প্রজ্ঞা'। জ্ঞাতের জানাকে বলা যায় স্মৃতি আর অজ্ঞাতের জানাকে বলা যায় প্রজ্ঞা। 'সমরাঙ্গণসূত্রধার'-এ প্রজ্ঞান যে ঠিক এই অর্থেই গৃহীত হইয়াছে একথা বলা যায় না। যে বিশেষ ভাবাভিনিবেশের দ্বারা চিত্রটি প্রাণময় ভাবময় ও রসময় হইয়া উঠে সেই ভাবরসের দৃষ্টিকে ও প্রাণপ্রদ দৃষ্টিকে 'সমরাঙ্গণসূত্রধার'-এ প্রজ্ঞা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য অজ্ঞতস্য প্রজ্ঞাত্রী এই লক্ষণের মধ্যে ভাবদৃষ্টি ও রসদৃষ্টিকেও আমরা অন্তর্ভুক্ত করিতে পারি। কিন্তু মনে হয় যে প্রজ্ঞার যে দৃষ্টি সেটি একটি অস্ফুট আলোকের ন্যায়। বাসনার বিদুরভূমি হইতে রত্নশলাকার ন্যায় তাহা প্রোদ্ভিন্ন হইয়া উঠে। কালিদাস যেমন শকুন্তলায় লিখিয়াছেন :

'তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি'।

এই প্রজ্ঞাদৃষ্টি যেন বাসনা প্রসূত সেই অবোধপূর্বস্মরণ। 'ন্যায়মঞ্জরী'-তে জয়ন্ত প্রতিভা বলিয়া একটি প্রমাণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদের অনেক সময় হঠাৎ মনে এইরূপ উদয় হয় যে আজই আমার ভ্রাতা আসিবে। এবং সেইদিনই হয়তো ভাই আসিয়া উপস্থিত হয়। এই যে অনাগত বিষয়ে হঠাৎ আমাদের বিনা কারণে জ্ঞান হয়, ইহাকেই প্রতিভা বলিয়া একটি স্বতন্ত্র জ্ঞান রূপে জয়ন্ত নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কোনও বাক্য শুনিয়া যে তাহার অর্থানুরূপ কাহারও মনে ভয়, কাহারও মনে বিরক্তি, কাহারও মনে বা অন্যবিধ ভাব উদ্রিক্ত হয়, এই যে বাক্যানুরূপ ভাবোল্লাস বাক্যার্থের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ পায়, তাহাকেও জয়ন্ত একস্থলে প্রতিভা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ('ন্যায়মঞ্জরী', ৩৬৬ পৃ.)। অন্যান্য স্থান পর্যালোচনা করিলেও দেখা যায় হঠাৎ যাহা মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে অথচ তাহার কারণ বলা যায় না তাহাকে প্রতিভা বলা হয়—যেমন মহাভারতে আছে : 'প্রতিভা নাস্তি মে কাচিৎ ত্বাং ব্রূয়ামনুমানতঃ'। এই সমস্ত স্থল পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে আমাদের অজ্ঞাত

সংস্কার হইতে যে দুর্জ্ঞেয় কারণে হঠাৎ জ্ঞানরশ্মি উদয় হয় তাহাকেই প্রতিভা বলা যায়। প্রতিভার এই অর্থ গ্রহণ করিলে রাজশেখরোক্ত প্রজ্ঞার সহিত ইহা অভিন্ন হয়। রাজশেখরোক্ত প্রতিভার অর্থ পূর্বেই বলা হইয়াছে। শিল্পশাস্ত্রোক্ত প্রজ্ঞাশব্দের অর্থও বলা হইয়াছে। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অনেকটা প্রতিভার ন্যায়। ইহাও হঠাৎ সংস্কার হইতে উৎপন্ন হয় এবং স্মৃতি হইতে বিভিন্ন। প্রতিভা, প্রজ্ঞা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিলে নিঃসংশয়রূপে এই প্রতীতি জন্মে যে স্মৃতি ছাড়া সংস্কার দুর্জ্ঞেয় উপায়ে নূতন জ্ঞান সৃষ্টি করিতে পারে। এই যে সংস্কারের সৃষ্টি তাহা যে কেবল জ্ঞানাকারে উদ্ভাসিত হয় তাহা নহে— তাহা নানাবিধ ভাব ও রসাকারেও আপনাকে অভিব্যক্ত করিতে পারে। শিল্পী যখন সমাধিদ্বারা চিত্রেয় বস্তুকে হৃদয়ের মধ্যে বিধারণ করেন তখন সেই সন্দোহ যে আনন্দধারায় তাহার হৃদয়কে অভিষিক্ত করে এবং যে আনন্দের বলে তিনি সমাধিকে দৃঢ় করিতে পারেন তাহাও সম্ভবত এই সংস্কার হইতেই উৎপন্ন হয়। চিত্তের মধ্যে একদিকে যেমন সংস্কার স্মৃতি ও সমাধির ক্রিয়া চলিতে থাকে সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের ঊহাপোহবৃত্তি (judgement)-ও চলিতে থাকে ও তাহার ব্যাপারের দ্বারা সমাধিধৃত রূপকে সংস্কৃত ও পরিষ্কৃত করিতে থাকে। এমনি করিয়া আমাদের চিত্তের নানাবৃত্তির সহযোগে যে অভিনব সৃষ্টি প্রক্রিয়া চলিতে থাকে তাহা যখন চিত্রপটে সঞ্চারিত হইতে থাকে তখনও সেই সৃষ্টি চিত্রীর নয়নগোচর হইয়া তাহার প্রতিক্রিয়ায় নূতন নূতন ঊহাপোহবৃত্তি উদ্বুদ্ধ করে ও নূতন নূতন ভাবে আমাদের স্মৃতি ও সংস্কারকে উদ্বোধিত করে; তাহার ফলে যে নূতন প্রতিক্রিয়া অন্তর হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাদ্বারা অনুপ্রেরিত হইয়া চিত্রী তখন চিত্রকে সংশোধন করিতে থাকনে ও নানা উন্মেষে তাহাকে উজ্জীবিত করিতে থাকেন। যিনি চিত্র দেখেন তাঁহারও মনে চিত্র দেখিয়া চিত্রি-সজাতীয় বহুধা বিমিশ্র অন্তর প্রক্রিয়া চলিতে থাকে; তাহার বিশিষ্ট সংস্কার বাসনা দ্বারা সংস্কৃত হইয়া তাহার মধ্যে চিত্রীর চিত্তকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করে এবং এই সৃষ্ট চিত্রের আনন্দে তাহাকে অভিষিক্ত করে। কাব্যের সম্বন্ধেও এই একই প্রকারের পদ্ধতি ঘটিয়া থাকে। এই ব্যাপারটিকে রাজশেখর নাম দিয়াছেন ভাবয়িত্রী-প্রতিভা। কেহ কেহ বলেন যে কারয়িত্রী-প্রতিভা ও ভাবয়িত্রী-প্রতিভা একই জাতীয়। আবার অন্য অনেকে বলেন যে কারয়িত্রী ও ভাবয়িত্রী প্রতিভা দুইটি বিভিন্ন প্রকারের, কেহ বা বলেন যে প্রতিভার তারতম্যানুসারে তাহাকে কারয়িত্রী বা ভাবয়িত্রী বলা যায়। কেহ কেহ বা ইহা একান্তভাবে অস্বীকার করেন।

'কশ্চিদ্বাচং রচয়িতুমলং শ্রোতুমেবাপরস্তাং
কল্যাণি তে মতিরুভয়থাবিস্ময়ং নস্তনোতি।
নহ্যেকস্মিন্নতিশয়বতাং সন্নিপাতো গুণানা—
মেকঃ সূতে কনকমুপলস্তৎপরীক্ষাক্ষমোঽন্যঃ।'

('কাব্যমীমাংসা', ১৪ পৃ.)

আমাদের মতে ভাবয়িত্রী-প্রতিভা না থাকিলে কারয়িত্রী-প্রতিভা সম্ভব নহে। কিন্তু কারয়িত্রী-প্রতিভা না থাকিলেও ভাবয়িত্রী-প্রতিভা থাকিতে পারে। কারয়িত্রী-প্রতিভায় যে

জাতীয় সমাধি স্মৃতি পর্যবেক্ষণ ও অভ্যাস প্রয়োজন, ভাবয়িত্রী-প্রতিভায় ততখানি তাহার প্রয়োজন নাই।

এই প্রসঙ্গে আর একটি দার্শনিক বিচারের কথা আমাদের মনে উদয় হয়, চিত্রকে আমরা সত্য বলিব কী মিথ্যা বলিব, ভ্রম বলিব, কী সন্দেহ বলিব? চিত্রিত বস্তুর ও চিত্রেয় বস্তুর সমান অর্থক্রিয়াকারিত্ব নাই; জীবন্ত ব্যাঘ্র মনুষ্য খাইতে পারে কিন্তু ব্যাঘ্রের চিত্র তাহা পারে না। অথচ ইহার যে কোনও অর্থক্রিয়াকারিত্ব নাই তাহাও বলা চলে না। চিত্রিত ব্যাঘ্র দেখিয়াও রাত্রিকালে কেহ ভয় পাইতে পারে, তাহা ছাড়া চিত্র দেখিয়া আমাদের চিত্তে নানাবিধ সুখদুঃখাদিভাব উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু শঙ্করাচার্য বলিয়াছেন যে রজ্জুতে মিথ্যা সর্প দেখিয়াও লোকে ভয়গ্রস্ত হইতে পারে। জীবন্ত ব্যাঘ্রকে স্পর্শেন্দ্রিয়দ্বারা ও অন্য বহুবিধ ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করা যায় কিন্তু চিত্রকে কেবলমাত্র চক্ষু ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু তাই বলিয়া চিত্রকে ভ্রম বলা যায় না। ভ্রমের নিয়ম এই যে বাধ হইলে ভ্রম আর থাকে না। চিত্রিত ব্যাঘ্রকে ব্যাঘ্র নয় বলিয়া জানিলেও ব্যাঘ্র প্রতীতি দূর হয় না। বাধ হইলেও যেখানে প্রতীতি দূর হয় না এবং কোনওকালে দূর হইবে এরূপ আশাও যখন করা যায় না তখন তাহাকে ভ্রম বলিব কীরূপে? যদিও চিত্রেয় বস্তুর ন্যায় চিত্রের কোনও অর্থক্রিয়াকারিত্ব নাই এবং সেইজন্য চিত্রেয় বস্তুর সমান পর্যায়ক সত্তা তাহাকে দেওয়া যায় না, তথাপি তাহারও যে জাতীয় অর্থক্রিয়াকারিত্ব পূর্বে উক্ত হইয়াছে তাহার বলে সত্তা দাবি করিবার তাহার অধিকার আছে। আমরা ভ্রমেতর এমন কোনও বস্তুর কথা জানি না, যাহার অর্থক্রিয়াকারিত্ব আছে অথচ সত্তা নাই। ভ্রমমাত্রই বিজ্ঞাননিরস্য। চৈত্রিক সত্তা কোনও বিজ্ঞানের নিরস্য নহে। এইজন্য ইহাকে যে ভ্রম বলা যায় না তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। দৃষ্ট ও স্মৃতের মধ্যে ভেদাগ্রহ কিংবা দৃষ্টবস্তুতে স্মৃতবস্তুর আরোপ প্রভৃতি যে সমস্ত ভ্রমলক্ষণ শাস্ত্রকারেরা করিয়াছেন তাহাও চিত্রে প্রযোজ্য নহে। পরন্তু অর্থার্থিভাবলক্ষণের দ্বারা ইহার একটি বিশেষ সত্তাপ্রতীতি স্ফুট হইয়া ওঠে। অর্থার্থিভাবলক্ষণসম্বন্ধের তাৎপর্য এই যে যাহা আমরা চাই তাহার সত্তাও আমরা মানিয়া লই। অনেকে বলেন যে অন্তরের এই চাওয়ার দাবিতে এই বাসনার বা কামনার প্ররোচনায় জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাবে সমগ্র জগৎ আমাদের নিকট প্রত্যক্ষায়মাণ হইতেছে। যাঁহারা বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদের মতের সহিত পরিচিত আছেন তাঁহারা জানেন যে বাসনার প্রেরণাতেই জগৎ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়রূপে প্রতিভাত হইতেছে। সৌন্দর্যের জন্য আমাদের চিত্তে একটি নিষ্প্রয়োজন পিপাসা আছে এবং কী হইলে সুন্দর হয় ও কী হইলে সুন্দর হয় না এই বিচারে আমাদের চিত্ত সর্বদাই সৌন্দর্যের মূল্য (value) নির্ধারণ করিতে ব্যাপৃত থাকে। মূল্যনির্ধারণ বা value sense অর্থার্থিভাবসম্বন্ধ লক্ষণেরই প্রকারবিশেষ। যাহা আমরা যে ভাবে চাই তাহারই সেইভাবে আমাদের নিকট মূল্য আছে। যাহার চাওয়া নাই অর্থাৎ যে জিনিস আমরা চাই না তাহার আমাদের নিকট কোনও মূল্যই নাই। শুধু ইহাই নহে, যে জিনিস আমরা যে ভাবে চাই তাহার মূল্যও আমরা সেই ভাবে স্বীকার করি। ক্ষুধিতের কাছে অন্নের মূল্য আছে কিন্তু ভুক্তব্যক্তির কাছে তাহার কোনও মূল্য নাই। আবার তাহারই

কাছে ভবিষ্যৎ ক্ষুধাসম্ভবনায় সেই অন্নের মূল্য আছে। যাহার কলমের প্রয়োজন তাহাকে অশন দিলে সে অশনের তাহার কাছে কোনও মূল্য নাই। চাওয়ার পরিমাণ, স্বভাব, দেশ কাল প্রকৃতির উপর প্রার্থিত বস্তুর মূল্য নির্ভর করে। সৌন্দর্য আমাদের কোনও বিশেষ বৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করে। আর কোনও উপায়ে সেইজাতীয় পরিতৃপ্তি ঘটে না। এইজন্য যখনই আমাদের ওইজাতীয় তৃপ্তি ঘটে তখনই সৌন্দর্যজাতীয় বস্তুর সত্তা আমরা না মানিয়া পারি না। এই সৌন্দর্যবৃত্তি কোনও ব্যক্তিবিশেষের ধর্ম নহে, ইহা সকল কালের সকল যুগের, মনুষ্যসাধারণের ধর্ম। মানুষ যেমন আহার চায়, নিদ্রা চায়, তেমনি সৌন্দর্যও চায়। আহার চাই বলিয়া আহার আছে আহার না চাহিলে আহার থাকিত না। কাজেই সত্তাকে আর একদিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখি যে যাহা আমাদের আন্তরবৃত্তির বিশেষ বিশেষ দাবিকে বিশেষ বিশেষ ভাবে পূরণ করে তাহা সেই বিশেষ বিশেষ ভাবে সত্তাসম্পন্ন। আমরা চিন্তা করি, চিন্তা না করিলে আমাদের মনোবৃত্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়, তাই মানিতে হয় যে জ্ঞান আছে। আমাদের জ্ঞান চায় একটা বিশেষজাতীয় স্ববিরোধপরিহার বা non-conttradiction, তাই মানিতে হয় যে সত্যের স্বভাব অবিরোধ — that truth is non-contradiction. আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় চায় রূপ, তাই আমরা মানি রূপের সত্তা। আমাদের সৌন্দর্যবৃত্তি চায় সৌন্দর্যের সৃষ্টি বা সৌন্দর্যের উপভোগ তাই মানিতে হয় সৌন্দর্যোপ-ভোগের সত্তা, সৌন্দর্যসৃষ্টির সত্তা ও সৌন্দর্যের সত্তা। আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা রূপ দেখি, তাই রূপের অস্তিত্ব মানি। স্পর্শেন্দ্রিয়ে কাঠিন্যাদি বোধ করি সেইজন্য কাঠিন্যাদিধর্মের বাহ্যসত্তা মানি। আমরা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শুনি, তাই শব্দ মানি, স্বরলহরী মানি, সংগীত মানি। এক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সত্তা গ্রহণ করি অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ পাই না। চক্ষু দিয়া রূপ দেখি বটে কিন্তু সত্যই রূপের সত্তা আছে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে স্পর্শ দ্বারা তাহার কোনও নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি না। স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা পাই তাহা কেবলই স্পর্শেন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা যাহা দেখি তাহা কেবলই চক্ষুরিন্দ্রিয়ায়ত্ত। বস্তুর সত্তা ও সত্যত্ব লইয়া আমাদের দেশে ও অন্যদেশে অনেক বিচার চলিয়াছে। কিন্তু কোনও ইন্দ্রিয় নির্ধারিত সত্তাকে তদ্‌গত নির্ধারণের পৌনঃপুন্যজনিত 'ইহা ইহাই' এইরূপে ছাড়া অন্যরূপে তাহার সত্যত্ব বুঝিবার কোনও উপায় নাই। চক্ষুতে দেখিলাম নীলরূপ। বোধ হইল নীলরূপের সত্তা। বারবার সেই বস্তুর সম্মুখে পার্শ্বে দূরে নিকটে গিয়া দেখিয়া যদি নীলরূপেরই প্রতীতি হয় এবং যদি আমরা নিঃসন্দেহ হই যে এই নীলরূপ আমাদের কোনও চাক্ষুষ দোষে উৎপন্ন হয় নাই কিংবা পরিপার্শ্বগত কোনও বস্তুর বিড়ম্বনায় যদি তাহার উৎপত্তি না হইয়া থাকে তাহা হইলে আমরা বলি যে যে নীলসত্তার প্রতীতি হইতেছে তাহা সত্য। অর্থাৎ নীল প্রতীতিও সত্য, ও নীলের বহিঃসত্তাও সত্য। সর্বত্রই অন্তঃপ্রতীতির সতত্যা বলেই বহিঃসত্তার সত্যত্ব অঙ্গীকার করি। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা যে প্রতীতি জন্মে তদিতরেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার পর্যনুযোগ সম্ভব নহে। আমাদের সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান ক্রিয়ার সহিত আমাদের যান্ত্রিক জীবনের একটা গূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে। অতি নিম্নস্তরের জীব হইতে আরম্ভ করিয়া আমরা যতই উপরের দিকে আসিতে থাকি ততই

দেখি যে সেই সেই জীবনের প্রয়োজন অনুসারে সেই সেই জীবনের বিশিষ্ট জাতীয় ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়া তাহাকে তাহার পারিপার্শ্বিক জগতের সহিত সম্বন্ধ করিয়াছে। জীবনের গতির মধ্যে যে একটি অব্যক্ত অন্তর্লীলা চলিয়াছে তাহাই সেই জীবের নিকট বিভিন্ন জাতীয় স্ফুট বা অস্ফুট ইচ্ছারূপে প্রতিভাত হয়। এবং সেই ইচ্ছার ফলেই এবং সেই ইচ্ছার অনুরূপ পদ্ধতিতেই তাহার সহিত জগতের যোগ হয়। এই যোগের ফলে নানা অনুভূতি উদ্রিক্ত হয় এবং সেই অনুভূতির সঞ্চার প্রতিসঞ্চারে ইচ্ছার দোলা ও জীবনের দোলা প্রতিকূলে বা অনুকূলে আন্দোলিত হইয়া সুখ-দুঃখের সূচনা করে। এই সুখ-দুঃখ বোধের দ্বারাই অন্তর্জীবনের সন্নিপাতবর্তী বস্তুর মূল্য নির্ধারিত হয়। যাহা জীবনলীলার স্বল্পাংশে উপযোগী হইয়া স্বল্পাবসরে বা স্বল্পমাত্রায় তাহার অনুকূল হয় তাহার মূল্য স্বল্প। এবং যাহা সমগ্র জীবনের প্রতি ব্যাপক ভাবে বা জীবনলীলার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দাবির প্রতি দুর্লভ ভাবে উপযোগী হয় তাহাকে আমরা অধিক মূল্য দিয়া থাকি। এই জন্যই আমাদের মধ্যে মূল্যের তারতম্য আছে। যে জাতীয় অভাবের দাবির বা সুপ্ত ইচ্ছার পূরণ যাহা দ্বারা হইতে পারে সেই ক্ষেত্রের মধ্যে তাহার ন্যায় মূল্য আর কিছুর নাই। ক্ষুধার সময় আহারের ন্যায় আর কিছুরই মূল্য নাই। কিন্তু সমগ্র জীবনের সমগ্রতার মধ্যে ব্যাপক ভাবে যে একটি চাওয়া রহিয়াছে তাহার পূরণ অন্যের দ্বারা সম্ভব নহে। মানুষ যে বর্তমানকে ছাড়িয়া ক্রমশ একটি অজ্ঞাত অস্ফুট আদর্শের দিকে তাহার জ্ঞাতে অজ্ঞাতে ছুটিয়া চলিয়াছে সেই আদর্শের অনুসন্ধানেই তাহার সেই সমগ্র জীবনের দাবিকে মিটাইতে পারে সেইজন্য সেইদিক হইতে আদর্শানুসন্ধানের মূল্য অনেক অধিক। তেমনি শিক্ষিত মনুষ্যের হৃদয়ের মধ্যে নানা সূক্ষ্ম তন্ত্রীতে নানাবিধ সূক্ষ্ম চাওয়া জাগিয়া উঠে। এই জাতীয় চাওয়া সে তাহার নিম্নস্তরের জীবনে পায় নাই। মানুষ প্রকৃতি দেখিয়া আনন্দে বিভোর হয়, সংগীত শুনিয়া তন্ময় হইয়া উঠে, সুন্দর বস্তু দেখিয়া আত্মহারা হয়, এবং সেইজন্যই এই জাতীয় চাওয়াকে যাহা পরিতৃপ্ত করিতে পারে সে তাহাকে অধিক মূল্য দেয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে মানুষ রূপসৃষ্টির কালে ধ্যানের দ্বারা, স্মৃতি দ্বারা, সমাধির দ্বারা ও 'তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বম' এতজ্জাতীয় সংস্কারের অস্ফুট আলোকের দ্বারা আপনাকে রেখায়, বর্ণে ও ভাষায় প্রকাশ করিতে চায় ও যাহা প্রকাশ করে তাহার সহিত আপনাকে পরিচিত করিতে চায়। এই প্রকাশ ও পরিচয়ব্যাপারে তাহার কোনও দৈহিক প্রয়োজনের সিদ্ধি হয় না এবং তাহার প্রয়োজনও রাখে না। কিন্তু তথাপি এই প্রকাশের জন্য, এই অনুভবের জন্য, তাহার চিত্তের মধ্যে এমন একটি প্রবল ইচ্ছা রহিয়াছে, এমন একটি গভীর বেদনা রহিয়াছে যাহার পূরণ ও শান্তি না হইলে সে তাহার জীবনকে বিফল মনে করে। সমগ্র জীবনের কামনা যেন পুঞ্জীভূত হইয়া, একমুখী হইয়া এই সৃষ্টি ব্যাপারের মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করিয়া তুলিতে চায়। যদিও এই কামনার মধ্যে নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিভাগের কথা আমরা পূর্বেই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি, তথাপি অঙ্গাঙ্গি ভাবে ওতপ্রোত হইয়া এমন সামঞ্জস্যে ও ঐক্যে তাহারা কাজ করে যে, মনে হয় যে তাহারা যেন একটি অবিশ্লেষ্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি। এইজন্য কবিত্বশক্তি বা চিত্রকারিত্বশক্তিকে অনেকে কেবলমাত্র চিত্রপ্রতিভা বা কবিত্বপ্রতিভা

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জগন্নাথ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, কেবলমাত্র কবিপ্রতিভাই কাব্য প্রণয়নের কারণ। এখানে একমাত্র প্রতিভা দ্বারা কবির সৃষ্টিকার্যের নানা শক্তি পরম্পরাকে একত্র করিয়া যেন একটি অখণ্ড ইন্দ্রিয় কাজ করিতেছে এইরূপ ভাবেই তাহারা গ্রহণ করিয়াছেন। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বেলাও আমরা চক্ষুর্জ্ঞানে অনেক স্তর বিভাগ করিতে পারি। চক্ষু কেবল মাত্র রূপকে গ্রহণ করে রূপের সহিত তৎসমবেত বস্তুকে গ্রহণ করিয়া সেই বস্তুটিকে চেনে, এমন কি উপনীতভানের দ্বারা অন্য ইন্দ্রিয়ের ধর্ম তাহাতে সংক্রান্ত করে অথচ নৈয়ায়িকের ন্যায় যুক্তিপটু দার্শনিক ও এই সমস্ত বিভিন্নজাতীয় ব্যাপারকে প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। কাজেই এই কথা বলা যাইতে পারে যে কবি প্রতিভা ও চিত্র প্রতিভার মধ্যে আমাদের সমগ্র জীবনের কী এক অজ্ঞাত রহস্যময় সত্যের আভাস পাই। গভীর আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া আমরা যাহা সৃষ্টি করি, যাহাকে সুন্দর বলিয়া অনুভব করি যাহাতে আনন্দরসে বিহুল হই তাহার প্রতিযোগী বহির্বস্তুকে আমরা অসৎ বা অসত্য কেমন করিয়া বলি। পূর্বেই বলিয়াছি যে যে, ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা গ্রহণ করা যায় তাহারা সত্তা বা সত্যত্ব সেই ইন্দ্রিয় দ্বারাই বুঝা যায় অন্য ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহার সত্তা বা সত্যত্ব সম্বন্ধে কোনও সংশয় বা পর্যনুযোগ করা সম্ভব নয়। প্রতিভা বৃত্তি দ্বারা যে চিত্রের সৌন্দর্যকে আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয় সহযোগে রেখা বর্ণাদির সহযোগে প্রত্যক্ষ করি সেই সৌন্দর্যসৃষ্টিকে বা সৌন্দর্যকে আন্তর বলিয়া মানিলেও তাহার বহিঃসত্ত্ব অস্বীকার করিতে পারি না। চিত্রে আমরা যে রেখাদির সন্নিবেশ করি, স্বতন্ত্রভাবে দেখিলে তাহা কেবলমাত্র রেখা বা বর্ণ ছাড়া আর কিছুই নয়, কিন্তু রেখা ও বর্ণাদি লইয়া চিত্রে যে রূপটি ফুটিয়া উঠে সেই রূপটি প্রতিভাদ্বারা সৃষ্ট এবং তাহার সৌন্দর্য প্রতিভাদ্বারা দৃষ্ট। এই জন্যই এই সৃষ্ট রূপটি ও তাহার সৌন্দর্যের কি জাতীয় সত্তা তাহা অন্য কোনও ইন্দ্রিয়দ্বারা নির্দেশ করিতে না পারিলেও প্রতিভেন্দ্রিয় দ্বারা তাহার সত্তা ও সত্যত্ব সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি। পৃথিবীতে আমরা যে সমস্ত বস্তু দেখি, রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ তাহা একত্র মিলাইয়া সেই বস্তুর কি স্বরূপ হয় তাহা আমরা অনুমানও করিতে পারি না, কল্পনাও করিতে পারি না। প্রাণি-জগতের ইতিহাস দেখিলে দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রাণি-শরীরে বিভিন্ন জাতীয় ইন্দ্রিয়, পরম্পরাক্রমে উদিত হইয়াছে। এইজন্য মানুষের মধ্যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হইলেও এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের এরূপ আন্তরিক সমাহার নাই যাহাদ্বারা প্রতি ইন্দ্রিয়ের অবিচ্ছিন্ন বোধ ছাড়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ের একটি সমাহৃত বোধ আমাদের মধ্যে উপস্থাপিত করিতে পারে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় তাহার স্বজাতীয় বোধ লইয়াই ব্যস্ত; অন্য জাতীয় বোধের মধ্যে তাহার কোনও অনুপ্রবেশ হয় না। কাজেই সর্বেন্দ্রিয় সমাহৃত জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তুস্বরূপ কীদৃশ সে সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণা নাই। প্রতি ইন্দ্রিয়ের পৃথক পৃথক জ্ঞানবিষয়ীভূত জ্ঞেয় বস্তুগুলিকে সংস্কারবশে বাহ্য ভাবে মিলিত করিয়া আমরা বস্তুরূপে ব্যবহার করি; এই পঞ্চেন্দ্রিয় ছাড়া যদি প্রতিভেন্দ্রিয় বলিয়া একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় মানা যায় তবে তাহার জ্ঞানবিষয়ীভূত জ্ঞেয়কেও অন্য জ্ঞেয়ের ন্যায়ই আমরা মনে করিতে পারি। 'বাক্যপদীয়'-তে লিখিত আছে : 'যে এই জগৎ শব্দেরই বিকারস্বরূপ। শব্দই জ্ঞানাকারে

পরিণত হইয়াছে।' এই কথাটিকে আমরা সত্য বলিয়াও বলিতে পারি মিথ্যা বলিয়াও বলিতে পারি। জগতের একটি শব্দরূপ আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। সকল জড়বস্তুরই একটি ধ্বনিরূপ আছে। ধ্বনিরূপ ছাড়া তার আরও অন্যরূপ থাকিতে পারে কিন্তু তাহা দ্বারা তাহার ধ্বনিরূপ ব্যাহত হয় না। তেমনি জগতের আরও সহস্রবিধরূপ দেখিলেও প্রতিভেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত জগতের সৌন্দর্যরূপতাকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। পরন্তু অর্থনির্ভাসলক্ষণ সম্বন্ধের দিক দিয়া বিচার করিলে আমাদের সৌন্দর্য-কামনার মধ্য দিয়া আমাদের জীবনের একটি রহস্যময় বিরাট আকাঙ্ক্ষা স্ফূর্ত্ত ও তৃপ্ত হয়। আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষার দিক বর্জন করিয়া বাহ্যবস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করা সুকঠিন। এমন কি একান্ত নিরয়ব কালগ্রহণ কালে ও তাহার পরিমাণাদি ধর্ম আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা দ্বারাই গৃহীত হয়। রেলওয়ে স্টেশনে বসিয়া নিরন্তর গাড়ি ছাড়ার কামনা চিত্তে উপস্থিত হইলে অতি স্বল্পকালকে অতি দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। আবার প্রিয়প্রিয়ার সংযোগে দীর্ঘ যামিনী মুহূর্তবৎ মনে হয়। যতক্ষণ কামনা থাকে ততক্ষণ কাম্যবস্তুর উপভোগে আভিমানিক আনন্দ উৎপন্ন হয়। আবার সেই কামনা না থাকিলে উপভোগের ব্যাপার মাত্রকে একান্ত অর্থহীন বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই অর্থার্থি-ভাবলক্ষণ-সম্বন্ধের দ্বারাও শিল্প বস্তুর সত্তা ও সত্যত্ব প্রমাণিত হয়।

*

GRONTH